নিরস্ত্র

বিমল কর

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা-৭৩

ভাদ্র ১৩৭২

প্রকাশক
সমীর কুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং হাউস
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা-২৯

মুদ্রাকর
মদনমোহন চৌধুরী
শ্রীদামোদর প্রেস
৫২এ কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলকাতা-৬২

প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়

দরজা খুলতে দেরি হল।

দরজা খুললেন বিন্নুর মা। বোধনকে দেখলেন। "ও, তুমি! বিন্নুর শরীর ভাল নেই।"

বোধন বিন্নুর মাকে দেখছিল। "কী হয়েছে ?"

"জ্বর।"

বিন্নুর মা দরজা পুরোপুরি খোলেন নি। এক পাট খুলে পাল্লায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে। ভেতরের দিকে বাতি জ্বলছিল। বিন্নুর মার মুখের ওপর অন্ধকার পড়ছে।

বোধন বিন্নুর মার মুখ দেখতে দেখতে বলল, "সকালে আসতে পারি নি তাই এখন এসেছিলাম। আমি তা হলে যাই!"

"আচ্ছা, এসো।"

বিন্নুর মা অপেক্ষা করছিলেন; বোধন পিঠ ফেরালেই দরজা বন্ধ করবেন। ভেতর থেকে বিন্নুর গলা শোনা গেল। "কে এসেছে, মা ?"

"বোধন।"

"বোধনদা! ওকে একটু বসতে বলো না— !"

ঘাড় ঘুরিয়ে বিন্নুর মা ঘরের দিকে তাকালেন। "বসতে বলব ?"

"হ্যাঁ বলো। আমার খুব দরকার। একটু বসুক"।

বিন্নুর মা বলতে যাচ্ছিলেন, 'তোমার না জ্বর—' না বলে বোধনের দিকে মুখ ফেরালেন আধাআধি। হয়ত বিরক্ত। "তুমি তা হলে বসো।"

বোধনকে ভেতরে আসতে জায়গা দিলেন বিন্নুর মা। বোধন ভেতরে আসতেই আবার দরজার ছিটকিনি তুলে দিলেন।

কয়েক পা এগিয়ে ডান দিকে বসার ঘর বিনুদের। বিনুর মা ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালালেন। পাখা চালাবার আগে ইতস্তত করলেন। "তুমি তবে বসো।"

ঘরটা আগোছালো হয়ে আছে। চায়ের কাপ, জলের গ্লাস কাচের প্লেট পড়েছিল সেণ্টার টেবিলের ওপর, সোফার পিঠে পাট করা সুজনি। হয়ত কেউ রেখে গিয়েছে।

বিনুর মা এটা ওটা তুলে নিচ্ছিলেন। "সারাদিনের একটা লোক পাই না এখানে! ঠিকে ঝি দিয়ে কত আর হবে! কী জায়গায় যে এসেছি!"

বোধন বিনুর মাকে অন্যমনস্কভাবে দেখছিল। দেখতে ভাল লাগে। অনেক ছিমছাম। আঁটোসাঁটো চেহারা, বাঁধা গড়ন। মোটাসোটা বেয়াড়া নয়। মাথায় বেশ লম্বা। গায়ের রঙ ধবধবে ফরসা নয়, তবে ফরসাই, গালের এক পাশে সামান্য নীলচে দাগ। বিনুর মার নাক উঁচু; চোখ বড় বড়। চোখে চশমা। রূপোলী ফ্রেমের চশমায় বিনুর মার মুখ ঝকঝক করছিল। বোধহয় সামান্য আগে গা ধুয়েছেন। চোখমুখ পরিষ্কার, ঝরঝরে। মুখে গলায় পাউডার বুলোনো। গলার ভাঁজে গুঁড়ো জমে আছে। পরনে কালো পাড়ের শাড়ি। ধবধব করছে জমি। গায়ে মিহি সাদা কাপড়ের জামা। মাথার চুল খোঁপা করে বাঁধা।

"বাইরে অনেকক্ষণ থেকে মেঘ ডাকছিল," বিনুর মা বললেন, "তুমি কি বৃষ্টির মধ্যেই এলে ?"

"না" মাথা নাড়ল বোধন, "গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ছিল। ও কিছু না।"

বিনুর মার হাতে সব আঁটছিল না। কিছু নিলেন, কিছু পড়ে থাকল। আবার আসবেন। উনি চলে গেলেন।

বোধন এতক্ষণে বসল।

বিনুর মাকে দেখলে বোধন আড়ষ্ট বোধ করে। নিজেদের কাছাকাছি মনে হয় না। সম্ভ্রম হয়। অমন সুশ্রী চেহারা, বয়েসও কম নয়। বিনুর মা এলোমেলো, আলগা কথা বলেন না। গলায় জোর নেই, ঠাণ্ডা স্বরে কথা বলেন। হাসাহাসি করা মুখ নয়, খানিকটা গম্ভীরই বরং। বোধন বিনুর মার সঙ্গে মাঝে মাঝে নিজের মার তুলনা করে। আকাশ পাতাল তফাৎ। বোধনের মা অন্যরকম। রাগী, বদমেজাজী, রুক্ষ। মুখে কিছু আটকায় না, গালিগালাজ খারাপ কথা—কিছুই নয়। মায়ের চেহারার সঙ্গেও বিনুর মার চেহারার মিল নেই। বোধনের মা মাথায় মাঝারী। থলথলে, জলেভরা চেহারা। বেমানান মোটা দেখায়, ফোলা ফোলা মুখ-চোখ। রক্ত কম থাকলে নাকি ওই রকম হয়। অ্যানেমিয়া। বোধন জানে না। তবে মার মুখ-চোখ খড়ির মতন সাদাটে, বিবর্ণ। গায়ের চামড়া খসখসে। মাথার চুল পেকে যাচ্ছে মার, গালে দাগ পড়ছে কালো কালো। মা যখন অফিসে যায়—বোধন দেখেছে, হাঁফাতে হাঁফাতে, চোখ-মুখ লাল করে ঘামতে ঘামতে।

পায়ের চটি চট চট করতে করতে বিনু এল। গায়ে সেই আলখাল্লা জামা, কাঁধ থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত মাটিতে লুটোনো। বিনুর হাতে রুমাল, গলায় পাতলা মাফলার জড়ানো রুক্ষ চুল, শুকনো মুখ। ছল ছল করছে।

"সকালে কী হল" ঘরে পা দিয়েই বিনু বলল। বলে উলটো দিকের সোফায় ধপ করে বসে পড়ল। নাক টানল। গলার টাগরায় শব্দ করল। সেন্টার টেবিলের দিকে তাকিয়ে নাক কোঁচকাল। "এতক্ষণ কী জ্বালাই জ্বালিয়ে গেল!"

"কে?"

"মার তুই বন্ধু। কেদার যেতে গিয়ে ভাব হয়েছিল মার সঙ্গে। বেড়াতে এসেছিল। কোথা থেকে এসেছিল জান? রিজেন্ট পার্ক। ওখান থেকে ঠেঙিয়ে কেউ এত দূর আসে! মাথা খারাপ! এসেছে সেই বিকেলের গোড়ায়, আর এই উঠল।"

বিনু আর বিনুর মা আলাদা। বিনু রোগা, টিঙটিঙ করছে, রঙ ময়লা। পাতলা, ছোট্ট মুখ বিনুর। কাটা কাটা নাক-চোখ। বিনুর চুল ঘাড় পর্যন্ত। কোঁকড়ানো। কথা বলার শেষ নেই বিনুর। সরু গলায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলে। এখন অবশ্য ভাঙা, বসে-যাওয়া গলায় কথা বলছিল। নাক বোজা।

"তোমার তো জ্বর!" বোধন বলল।

"শুধু জ্বর! বাব্বা—, এ একেবারে হাড্ডি জ্বর" বিনু নাক টেনে গলা পরিষ্কার করল।

"কেমন করে হলো, শোনো!" বিনু বলল, "পরশু দিন নুন শোয়ে লোটাস সিনেমায় গিয়েছিলাম, চার বন্ধু। বেরিয়ে দেখি, বন্যা। কী বৃষ্টি কী বৃষ্টি! চার বন্ধু হাবুডুবু খেতে খেতে, ভিজে ন্যাতা হয়ে সন্ধে-বেলায় বাড়ি। আর যাবে কোথায়! রাত্তির থেকেই হুহু···।"

বিনুর মা আবার এলেন। বাকি জিনিসগুলো তুলে নিতে নিতে মাথার ওপরে তাকালেন। "পাখা কম করে নাও।"

"নিবিয়ে দাও না! আমার শীত করছে।"

"গায়ে জড়ালেই আবার গরম লাগছে।"

বিনুর মা সামান্য বিরক্ত হলেন হয়ত। পাখা নিবিয়ে দিলেন দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন।

"তুমি কি চা বসিয়েছ?" বিনু বলল।

"চা?···না। কেন?"

"আমাদের খেতে ইচ্ছে করছে।"

আমাদের কথাটায় বোধন অপ্রস্তুত হল। বিনুর মার দিকে তাকাতে পারল না।

"এই তো খেলে খানিকটা আগে," বিনুর মা বললেন।

"এই তো কোথায়, সে অনেকক্ষণ! তাও সবটা খাই নি। তোমার বন্ধুরা যা গলগল করছিল, উঠে এসে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে যাচ্ছিলাম। একজন তো দেখলাম, চিনি ছড়িয়ে দিয়ে লুচি বেগুনভাজা খেল।" বিনু হেসে কুটোকুটি।

"তুমি বড় অসভ্য হয়ে উঠেছ! যে যেমন খায়—।" বিনুর মা মেয়েকে ধমকালেন।

উনি আবার চলে যাচ্ছেন, বিনু চায়ের কথা মনে করিয়ে দিল।

"কাকা এলে হবে", বিনুর মা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

বিনু নাক কোঁচকাল—কাকা এলে। পা তুলে নাচাতে গিয়ে এক পায়ের চটি খুলে গেল, যেন ছুঁড়েই দিল বিনু। বিড় বিড় করার মতন ঠোঁট কাঁপল, কিছু শোনা গেল না।

"সকালে তোমার কী হয়েছিল?" বিনু দু মুহূর্ত অন্যমনস্ক থেকে আবার ঠিক হয়ে গেল।

"বাড়ির একটা কাজে আটকে গিয়েছিলাম" বোধন বলল, বলে আবার কিছু মনে পড়ে গেল। "এলেই বা কি হত! তোমার জ্বর।"

"আজ আর তেমন জ্বর কোথায়! কাল যা গিয়েছে, যত জ্বর, তত মাথা ব্যথা। গা হাত চিবিয়ে খাচ্ছিল। পটাপট ওষুধ খেয়েছি। যায় নাকি! এ হল খাঁটি ইউনিফ্লুয়েঞ্জা। জাপান থেকে এসেছে।"

বোধন হেসে উঠল।

"হাসছ! হাসার কি দেখলে। জাপান থেকে হংকং থেকে কত কি আসছে। কাগজ পড় না।"

বোধন মাথা নাড়ল। মজা করে। বিন্নুকে তেমন দূর দূর মনে হয় না। সত্যি, ভাল লাগে।

"আজ জ্বর কত?" বোধন কথা ঘুরোতে চাইল।

"আজ কম! সকালে একশো ছিল। দুপুরেও তাই। এখন জানি না।"

"আমার সঙ্গে কী দরকার ছিল বলছিলে?" বোধন বলল।

"ধুত, দরকার আবার কি! সারাদিন বিছানায় শুয়ে আছি, ভাল লাগছিল না। বিবিধ ভারতী শুনতে শুনতে কানে তালা লেগে গেল। গল্পের বই পড়তেও ভাল লাগছিল না—", বলেই বিন্নু আচমকা থামল, তারপর পরম বিস্ময়ের চোখ করে বলল, "ও হরি! বলতেই ভুলে গিয়েছি। তুমি ওটা কি লিখেছিলে খাতায়? গোজামিল যা চালাচ্ছো!"

বোধন অবাক। "গোঁজামিল?"

"সিলিকনের অ্যাটমিক ওয়েট কত?"

"কেন?"

"টুয়েন্টি সেভেন পয়েণ্ট ওয়ান নয়; টুয়েন্টি এইট পয়েণ্ট থ্রি। বইয়ে আছে।"

বোধন বোকার মতন তাকাল। "নাকি? ভুল হয়েছিল আমার। বই ঠিক দেখেছ তো?"

"দেখবে তুমি?"

"না না, আমার দেখার দরকার নেই। তুমি তো দেখেছ!" বোধন যেন ব্যাপারটা এড়াতে চাইল।

"আর—একটা গোঁজামিল বলব?"

বোধন অপ্রস্তুত, কুণ্ঠিত হল। রাগও হল সামান্য। বলল, "দেখো, আমি কিন্তু আগেই বলেছি আমি গাধাবোট। পাস কোর্সের

বি এস-সি। কিচ্ছু জানি না। যেমন ফিজিক্স, তেমনি কেমিস্ট্রি—সবেই মাস্টার।”

বিনু মুঠো তুলে বুড়ো আঙুল দেখাল। “আমারও তো ওই দশা হচ্ছে। পাস কোর্সে বি এস-সি পড়ছি। আমারও কাঁচকলা হবে। এর চেয়ে বটানি পড়লে ভাল হত। দিস ইজ কচু, দিস ইজ মোচা বলে চালাতাম। সুষমি কি মজাসে আছে!” বিনু সর্দি জড়ানো বসা গলায় হাসতে গিয়ে কাশতে লাগল।

বোধনের হাসি পাচ্ছিল না। বিনুকে পড়াবার জন্যে সে যেচে আসে নি। তেমন যোগ্যতা যে তার নেই—বোধন জানে। সাধারণ ছেলে সে, মাথা মোটা। রগড়ে রগড়ে পরীক্ষায় পাস। বন্ধুদের সঙ্গে হল্লা করে বি এস-সি পড়তে ঢুকেছিল। পাস কোর্স। কোনো রকমে টপকে গিয়েছে। নিজের লেখাপড়া সম্পর্কে তার কোনো অহঙ্কার নেই। বিনুও ভাল ছাত্রী নয়, লেখাপড়াতেও তার মন নেই। এখন সবে ফার্স্ট ইয়ার। শখের পড়া পড়তে ঢুকেছে। শখের পড়া বলেই শখের মাস্টার। আসলে মাস্টার নয় বিনুর হেলপার: এটা টুকে দাও, ওটা খুঁজে দেখো—এই আর কি! বোধনকে এই বাড়িতে এনে ঢুকিয়ে দিয়েছে সুকুমারদা। মাস্টারী নয়, অল্পস্বল্প দেখিয়ে দেবার জন্যে। বিনুর মা পঞ্চাশটা করে টাকা দেন মাসে। গত মাসে পেয়েছে বোধন, প্রথম। এ-মাসেও পাবে। আজ সেই টাকার জন্যে এসেছে বোধন। টাকাটা বড় দরকার। দরকার বলেই সন্ধেবেলায় আসা। নয়ত তার আসার সময় সকাল।

বোধন অন্যমনস্কভাবে বিনুর দিকে তাকাল। আগের বার বিনুর মা নিজেই ঠিক সময়ে টাকাটা দিয়েছিলেন। সাত তারিখে। তারপর পুজো পড়ল। এবারেও দেবেন এই আশা নিয়ে বোধন এসেছে। বিনুর মা তো কিছু বললেন না। ভুলে গিয়েছেন নাকি?

বিনু সামান্য চুপ করে ছিল ; হঠাৎ বলল, "তুমি কেন আলতু-ফালতু পড়তে গেলে ! ছেলেদের পাস কোর্সে পড়ে কিছু হয় না।"

"আমারও কিছু হবে না", বোধন বলল ; পুরোপুরি ঠাট্টা করে নয়।

বিনুর মা ডাকছিলেন।

উঠে গেল বিনু।

বোধন বুঝতে পারল না বিনুর মা কেন ডাকলেন ? তিনি কি বিনুর গল্প করা পছন্দ করছেন না ? গায়ে জ্বর নিয়ে এতক্ষণ বকবক করা যে বিনুর ভাল হচ্ছে না—হয়ত মেয়েকে সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছেন। বা, বোধনের হঠাৎ মনে হল, বিনুর মার হয়ত টাকার কথা মনে পড়ে গিয়েছে। বিনুর হাত দিয়েও টাকা পাঠিয়ে দিতে পারেন। বোধনের একটু আশা জাগল। যদি টাকা না আনে বিনু, বোধন কি একবার মুখ ফুটে বলবে ? সেটা কি ভাল দেখাবে ? বিনুর জ্বর, এখন কি টাকার কথা তোলা উচিত ? তা ছাড়া টাকা পয়সার ব্যাপারটা বিনুর কাছে না তুলে বিনুর মার কাছে তোলাই উচিত।

বিনু এল। হাতে দু কাপ চা। "ধরো শীগ্রি··· !"

বোধন খানিকটা থতমত খেয়ে গিয়েছিল, হাত বাড়িয়ে চা নিল।

"চা আমার দরকার ছিল না," বোধন বলল।

"আমার গলায় ব্যথা, গরম চা খেলে আরাম লাগে", বিনু বলল।

চা খেতে খেতে বিনু আরও পাঁচটা কথা বলল, এলোমেলো হালকা কথা।

বোধন চা শেষ করল। "আমি তা হলে যাই।"

"কবে আসবে ?"

"দেখি তোমার তো জ্বর।"

"ধ্যুত, এ সেরে গেছে। কাল ঠিক হয়ে যাব।···তুমি পরশু এসো।"

বোধন হতাশ হয়ে পড়েছিল। টাকাটা কত পিছিয়ে গেল। বলবে নাকি বিনুকে। বিনু বড় সাদামাটা সরল। সে কিছু মনে করবে না। টাকার দরকার মানুষের হতেই পারে। লজ্জার কি রয়েছে?

উঠে পড়ল বোধন। বিনুও।

সদরে এসে বোধন হঠাৎ বলল, "মাসীমার সঙ্গে একটু দরকার ছিল।"

"মার সঙ্গে? ডাকব মাকে?"

বোধন আরও আড়ষ্ট হয়ে গেল। "না, থাক; আমি বরং কাল একবার আসব।"

"তাই এসো।"

বোধন বাইরে পা বাড়াল।

দুই

এখন বর্ষা নয়, যখন তখন বৃষ্টি আসার কথাও না। তবু আজ কদিন ধরেই বর্ষার ভাব চলছে। কার্তিক মাস শেষ হয়ে গেল। আর ভাল লাগে না বৃষ্টি-বাদলা।

বোধন খানিকক্ষণ ঘুরে ফিরে,তারা ইলেকট্রিকস'-এ গিয়ে বসল, ততক্ষণে হালকা বৃষ্টি নেমেছে, পাড়াও ঘুটঘুটে। আলো আসতে আসতে রাত নটা দশটা।

তারা ইলেকট্রিকস-এ সুকুমারদা আর জগৎ দাবা খেলছে মোমবাতি জ্বালিয়ে। দোকানটা সুকুমারদার।

বোধনকে দেখল সুকুমার। দেখেও কিছু বলল না। ঘোড়ার চাল নিয়ে মগ্ন। খেলা প্রায় শেষ।

জগৎ তার গজ সামলাচ্ছে।

বোধন একটা টুলের ওপর বসল।

দোকানটা ছোট। থাকার মধ্যে একটা পুরোনো কাউণ্টার টেবিল, পেছন ভাঙাচোরা আলমারি, ডান দিকে লোহার এক র‍্যাক। গোটা তিনেক নানান ধরনের চেয়ার, ছোট বেঞ্চি। ঘরাঞ্চিটা একপাশে দাঁড় করানো আছে। সামনেই রাস্তা। লোকজন, সাইকেল রিকশা যাচ্ছে অনবরত।

জগৎ সুকুমারের দোকানের লোক বয়েস কম। জগতের কাজ হল দোকান আগলে বসে থাকা।

সুকুমার বেয়াড়া একটা চাল দিয়ে জগতকে আরও ঝঞ্ঝাটে ফেলে

দিল যেন। দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। বোধনের দিকে তাকাল আবার। "কি রে, কাজটা করে দে।"

"এখন ?"

"এখন না কখন ? তোর জন্যে বিল ছাড়তে পারছি না। নে লেগে যা…।"

সুকুমারদার অনেক কিছুতেই বোধনের মজা লাগে। যেমন এই বিল। কোন বাড়িতে একটা সুইচ পালটেছে, কার বাড়িতে লাইনের গণ্ডগোল মেরামত করেছে, কার ইস্ত্রি সেরেছে, কিংবা পাখা মেরামত করে দিয়েছে—সব কিছুতেই বিল। 'তারা ইলেকট্রিকসের' ছাপানো পাতায় দু টাকা চার টাকা আট টাকা সব কিছুর বিল লিখতে হবে। হাতে নাতে কাজটা হতে পারত, কিন্তু সুকুমারদা করবে না। বিলে নাকি ইজ্জত বাড়ে। সুকুমারদার দোকানে বালব, ফিউজের তার, প্লাগ, চোক্—এ-সবও কিছু না কিছু বিক্রী হয়। তার বেলাতেও কাঁচা ক্যাশ মেমো। জগৎ ঠিক মেমো লিখতে পারে না, কাঁচা হাতের লেখা, অদ্ভুত বানান—তবু ইংরেজি হরফে ও-সব তাকে লিখতেই হবে। সুকুমারদার নিজের হাতের লেখা এবং বানান জগতের বাড়া। ক্যাশ মেমো যেমনই হোক বিল গবেটের মতন লেখা যায় না। তাতে নাকি দোকানের এবং দোকানের মালিকের 'প্রেস্টিজ' চলে যায়। কাজেই সুকুমারদা বোধনকে দিয়েই কাজগুলো করিয়ে নেয়, বিল লেখা, খুচরো বিক্রীর হিসেব তুলে খাতায় ভরা। বোধনকে সুকুমারদা যখন যেমন পারে পাঁচ দশ দিয়েও থাকে।

এক একজন মানুষ থাকে যাদের হাজার বললেও কিছু বোঝে না। সুকুমারদা সেই রকম। তার ধারণা, বোধন একজন দিগগজ। বি এস-সি পাস করেছে বোধন, সুকুমারদার ধারণা সে সায়েন্স মাস্টার।

আসলে বোধনকে ভালবাসে সুকুমারদা। ভালবাসে, কারণ এই

পাড়ার বেশীর ভাগ ছেলের মতন বোধন হললাবাজ, রুক্ষ, নেশাখোর, হতচ্ছাড়া নয়। এই ভালবাসার দৌলতেই বোধনের ভাগ্যে বিনু—বা বিনুর মার পঞ্চাশটা টাকা জুটেছে একমাস। এ-মাসেও জুটবে। কিন্তু টাকাটা আজ পাওয়া গেল না।

কোথায় কি আছে দোকানের বোধন জানে। খাতাপত্র, তারা ইলেকট্রিকস-এর ছাপানো প্যাড বার করে নিল বোধন।

"কটা বিল হবে?"

"খাতা দেখ। লেখা আছে।"

জগৎ পালটা চাল দিল।

সুকুমার মুঠো পাকিয়ে শব্দ করে করে বার দুই টান দিল সিগারেটে। পালটা চাল দেখল। নিজের চাল ভাবল। তারপর হঠাৎ মজার গলায় গান গেয়ে উঠল: 'আয় মা তারা নেচে নেচে...।' গান শেষ না করেই জগতের পালটা চাল নষ্ট করে দিয়ে বলল, "তোর দ্বারা দাবা হবে না, জগৎ। তুই বেটা চাইনিজ চেকার খেল। উল্লুক তুই।"

জগৎ কিছু বলল না। মাথা চুলকোলো। সুকুমারদার ভয়ে তাকে দাবা খেলতে হয়। সুকুমারদার ধারণা, বোকা জগতকে দাবায় নামিয়ে সুকুমারদা তার মাথা সাফ করে দেবে।

বৃষ্টি পড়ছে। খেলা চলছে। অন্ধকার রাস্তা দিয়ে রিকশা যাচ্ছে ঘন্টি বাজিয়ে।

বোধন একটা পকেট সাইজের খাতা থেকে সুকুমারের হাতের লেখা কাজের ফিরিস্তি উদ্ধার করছিল। "এটা কি লিখেছ?"

সুকুমার খাতা দেখল। নিজেই যেন বুঝতে পারল না। ঘাড় চুলকোলো। "ছ নম্বর বাড়িতে কী হয়েছিল রে, জগৎ?"

"ছ নম্বর!...ওই শ্বেতীবাবুর বাড়ি?"

"শ্বেতী তো তোর কি শালা! কার শ্বেতী, কার মেতী—তোকে কে দেখতে বলেছে! খদ্দের খদ্দের! খদ্দেরের নামে ফালতু কথা বলবি না।"

জগৎ ঘাবড়ে গেল। বলল, "বাড়ির কাজ আমি কি জানব?"

"বারে শালা, দোকান থেকে মাল গেছে, তুই কি জানবি?"

"বাচ্চু কাজ করেছে ছ নম্বরে।" বলেই জগতের মনে পড়ে গেল ছ নম্বরে নতুন টিউব লাইট লাগানো হয়েছে। বলল, "টিউব লাইট।"

বোধন হেসে ফেলল। সুকুমারদা দারুণ লিখেছে খাতায়। ফিশিংটা বোধহয় ফিক্সিং "তুমি এ-সব লিখলে আমি কি বুঝব? বাংলায় লিখে রেখো।"

সুকুমার গম্ভীর মেজাজে বলল, "বাংলা মুদির দোকানে লেখে। আমাদেরটা ইলেকট্রিক।"

বোধন আরও জোরে হেসে উঠল।

খেলা বন্ধ করে দিল সুকুমার। আর দু তিনটে দান হলেই খেলা শেষ হত। জগতের কিছু করার ছিল না। "তুই বেটা কাল থেকে লুডো এনে রাখবি দোকানে, তোর সঙ্গে লুডো খেলব। উল্লুক।

জগৎ যেন বেঁচে গেল। সুকুমারদার সঙ্গে দাবা খেলাটাই তার শাস্তি।

"সিগারেট খাবি?" সুকুমার বলল বোধনকে।

"দাও।"

জগৎ উসখুস করল। বাইরে যাবে একবার। দোকানের এদিক ওদিক হাতড়ে একটা ভাঙা ছাতা বার করল। তারপর ছুটল।

বোধন সিগারেট ধরিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে কাজ করতে লাগল।

সুকুমার বলল, "একটা বড় কাজ ধরেছি রে? উনিশ নম্বরে বাড়ি হচ্ছে। চাটুজ্যেবাবুর বন্ধু। ইলেকট্রিকের সব কাজ আমার।"

"বাঃ, ভাল কথা।"

"আসছে মাসে বিয়েও আছে। পাড়ায় তিনটে বিয়ে. একটা অন্তত পাব, কি বল!"

"পাবে না কেন! তুমি যে-ভাবে পয়সা ফেলে রাখো বাপীরা পারবে না।"

"তুই বিজনেসের ঘণ্টা বুঝিস।" সুকুমার বলল, "আমার বাপও বিজনেস করত। আমি বিজনেসের বাচ্চা। বাবা সাইকেল বেচত। মাসে পাঁচ সাত হাজার টাকার কারবার। ডুবল যখন কাটা ঘুড়ির মতন ফক্কা হয়ে গেল। কিন্তু তোকে বলছি পয়সা ফেলে না রাখলে ব্যবসা হয় না। যার কাছে তুই পয়সা পাবি জানবি সে তোর হাতে আছে।"

"এটা কী লিখেছ?"

"লেখাপড়া শিখেছিলি কেন? সব সময়ে এটা কী ওটা কী? বুঝে নিতে পারিস না?"

বোধন হাসল। "ইস্ত্রি মেরামত করেছিলে ধরবাবুর?"

"হ্যাঁ।"

বোধন বিল লিখতে লাগল। লিখতে লিখতে বলল, "সুভাষ ক্লাব কালী পুজোর টাকা দিয়েছে?"

"এই হপ্তায় দেবে বলেছে। না দিলে ফকিরের পেন্টুন খুলে নেব। সুকু দত্তকে চেনে না!"

বোধন কিছু বলল না।

সুকুমার বাইরের বৃষ্টি দেখতে দেখতে বলল, "একটা কথা ভাবছি। দোকানে একটা রেডিও সারাই ডিপার্টমেণ্ট রাখলে কেমন হয় রে?"

বোধন মজা পেল। দশ হাতের দোকান, তার আবার ডিপার্টমেণ্ট। ছোট কথা সুকুমারদা বলবে না। "সারাবে কে? তুমি?"

"তুই।"

"আমি?" বোধন অবাক।

"লেখাপড়া শিখলি কেন ফালতু? যেদো মেধো রেডিও সারায় —তুই পারবি না? ম্যাডান স্ট্রীটে যা—দেখবি পানের দোকানে রেডিও সারাচ্ছে। তুই বলিস কিরে? গলায় দড়ি দিগে যা!"

বোধন হাসল না। সুকুমারদা এইরকমই। বলল, "শিখলে সব কাজই পারা যায়।

"তুইও শিখে নিবি। কী আছে শিখতে। আমি একটু আধটু জানি। তোকে দীনুর সঙ্গে লাগিয়ে দেব। দীনু তোকে একমাসে মাস্টার করে দেবে।"

বোধন কিছু বলল না।

সুকুমার যেন স্বপ্ন দেখতে দেখতে বলল, "দোকানটা বড় করতে হবে রে, বোধন। আমার মা আর বউয়ের মধ্যে রোজ খেঁচামেচি লাগে। মা বর্ধমানে দেশ বাড়িতে চলে যেতে চায়। তা ধর, সেখানে কিই বা আছে। মা যদি যায়—আর একটা বাড়তি খোরপোশের ব্যবস্থা চাই।"

বোধন হঠাৎ বলল, "তোমার কাছে টাকা আছে?"

"টাকা! কত?"

"গোটা দশেক অন্তত।"

"কী করবি?"

"মার পা মচকে গিয়েছে। গোড়ালির কাছটায়। ফুলে ঢোল হয়ে আছে। একটা মালিশ কিনব, আর একটা ক্রেপ ব্যাণ্ডেজ। ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বেঁধে রাখলে ব্যথা কম লাগবে।"

সুকুমার পকেট হাতড়াচ্ছিল। খুচরো নোট, পয়সা সব রাখতে রাখতে বলল, "মাসীমা অফিস যাচ্ছে?"

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গিয়েছে আজ।"

"ছুটি নিতে বল। দশটা তো হচ্ছে না রে, সাত হচ্ছে। সাতে হবে ?"

"কি জানি !"

"না হয় বুড়োবাবুকে বলবি, কাল নেবে। তুই সাহা ফার্মেসিতে যাবি তো ? বলবি বুড়োবাবুকে। আমার নাম বলবি।"

এইভাবে টাকা নেওয়ার অস্বস্তি হচ্ছিল বোধনের। কৈফিয়ত দেবার মতন করে বলল, "বিনুদের টাকাটা পাই নি এখনও। আজ গিয়েছিলাম।"

"পেলি না কেন ?"

"বিনুর জ্বর। ওর মা কিছু বললেন না।"

"তুই চাইলি না কেন ?"

"বাঃ, কেমন করে চাইব ! বিনুর জ্বর !"

সুকুমার হঠাৎ হেসে উঠল। "তুই যে আমার লাইনে বিজনেস করছিস, বোধন। টাকা ফেলে রাখছিস। তোর হবে।"

বোধন লজ্জা পেল। কথাটার কী মানে ? বলল, "না সুকুমারদা আজ আমার টাকার খুব দরকার ছিল। চাইব ভেবেছিলাম পারলাম না।"

সুকুমার টাকা পয়সার সঙ্গে পকেট-চিরুনি বার করেছিল। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল, "তা দরকার পড়লে চাইবি না ? তোর দরকার। চাইলে কিছু মনে করত না। ওরা লোক ভাল।"

বোধন ইস্ত্রি মেরামতের বিল লেখা শেষ করল।

বৃষ্টি কমে আসছে। ছাড়ে নি। ঘুটঘুটে ভাব যেমন ছিল সেইরকমই।

বলব কি বলব না করে বোধন বলল, "তুমি আমায় অ্যায়স

ঝঞ্ঝাটে ফেলেছ। পড়ানো-টড়ানো আমার হয় না। ছেড়ে দিতে হবে।”

“কেন ? মাসে পঞ্চাশটা টাকা আসছে।”

“পড়াতে পারি না। ভুল হয়।”

“হোক।” সুকুমার বলল, “কোথায় ঠিক ঠিক পড়ায় রে ? স্কুলে পড়ায় ? আমাদের এখানকার স্কুলটার হাল দেখছিস না। মাস্টার-গুলো ইঁট মারামারি করে স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে পুজোর আগে থেকেই।”

বোধন এখানকার স্কুলের ব্যাপারটা জানে। দু দল মাস্টারে মারপিট করেছে। দলাদলির ব্যাপার। স্কুলের কর্তৃত্ব কে করবে তাই নিয়ে লড়াই। পলিটিকস।

নতুন করে একটা বিল লেখা শুরু করল বোধন। এই লেখাটা আন্দাজে পড়তে পারছে সে। হিটার মেরামতি। লিখতে লিখতে বোধনের মনে হল, সুকুমারদার কাছে সে পুরো সত্যি কথাটা বলে নি। আজ তার টাকার দরকার মায়ের জন্যে তেমন ছিল না। বোধনের প্যান্ট নেই, মানে—যা আছে দু তিনটে—তার মধ্যে দুটোই ছেঁড়া, রং বলে আর কিছু নেই। বোধন একটা প্যান্ট করতে দিয়েছে। গত হপ্তায় নেবার কথা। নিতে পারছে না। তিরিশটা টাকা লাগবে। টাকা পেলে আজ নিত। নেব বলেছিল দোকানে। হাতে বাকী যা থাকত তাতে মার জন্যে মালিশ হয়ে যেত।

সুকুমার বলল, “তুই ও বাড়িতে কবে যাবি রে ? কাল ?”

“যাব ভাবছি।”

“ও-বাড়ির মাসীমাকে বলবি, আমি আসছে হপ্তায় গিয়ে মেগার করে দেব। বহুত বিল যাচ্ছে।”

বোধন নীচু মুখে কাজ করতে লাগল।

আবার কিছু মনে পড়ল সুকুমারের। "আরে বোধন, তুই বিনুর কাকাকে ধর না।"

মুখ তুলে তাকাল বোধন। কাকা?

"ভদ্রলোক বড় চাকরি করে।" সুকুমার বলল, "কোন অফিসে যেন! চৌরঙ্গিতে অফিস।"

জবাব দিল না বোধন।

নিজের মনেই সুকুমার বলল, "ভদ্রলোকের স্যাকরিফাইস আছে। বিয়ে থা করে নি। বউদি আর তার মেয়েকে টানছে। তাও নিজের বউদি নয়।"

বিনুর নামটা বোধনের মনে এল, বিনতা মজুমদার। বিনুর কাকার নামও জানে বোধন : গিরীন সরকার। বিনু একদিন বলেছিল, তার বাবার পিসতুতো না মাসতুতো ভাই হয় কাকা। বিনুর বাবা আজ দশ বারো বছর হল মারা গিয়েছেন।

একটা ব্যাপার কিন্তু বোধনের ভাল লাগে না। বিনুর কাকা বিনুর মাকে নাম ধরে ডাকে। অনুপমাকে ছোট করে অনু বলে। কেন বলে? তা ছাড়া বিনুর মা বিধবা। তবু মাছটাছ, পিঁয়াজ সবই খান। বিনুর মুখেই শুনেছে বোধন।

বোধন বিনুর মাকে ঠিক বুঝতে পারে না।

তিন

বোধন অন্য দিনের তুলনায় আগে আগে বাড়ি ফিরল। দরজা ভেজানো ছিল। আলো এসেছে কিছুক্ষণ আগে। বাড়িতে পা দিয়ে বোধন বাবাকেই দেখল।

বাবা নিজের জায়গায় বসে। মিটমিটে আলোটা যেমন জ্বলে তেমনই জ্বলছিল মাথার ওপর।

পায়ের চটিটা খুলে রাখছিল বোধন, দরজার কাছে পায়ের শব্দ পেল। চুয়া। চুয়া ভেতরে এসে দরজা বন্ধ করল।

নীচু গলায় বোধন বলল, "কোথায় গিয়েছিলি ?"

"হট ওয়াটার ব্যাগ আনতে। তল্লাট খুঁজে বনোদের বাড়ি থেকে নিয়ে এলাম।"

"কী হবে ব্যাগে ?"

"মা পায়ে সেঁক দেবে।"

চুয়া রান্নাঘরের দিকে চলে যাচ্ছিল বোধন বলল, "একটা মালিশ এনেছি, মাকে দিয়ে আয়।"

চুয়া মাথা নাড়ল। "তুমি দিয়ে এসো।" চুয়া দাঁড়াল না, রান্না-ঘরের দিকে চলে গেল।

মাকে এড়াতে চাইছিল বোধন। মার সামনাসামনি দাঁড়াতে তার অস্বস্তি হয়, বিশেষ করে এখন মা কেমন মেজাজে আছে বোঝাই যায়।

একটু দাঁড়িয়ে থাকল বোধন। বাবাকে আবার দেখল। নিজের

কাঠের চেয়ারটিতে বসে বাবা টেবিলের ওপর খানিকটা ঝুঁকে পড়েছে। হাতে পেনসিল। দু টুকরো কাগজ ছড়ানো। সামনে মোটা সোটা ওয়েবস্টার, একটা পত্রিকা। বাবার পিঠের দিকে দেওয়াল আর চেয়ার ঠেস দিয়ে ক্রাচটা দাঁড় করানো।

বোধন আড়ষ্ট পায়ে মার ঘরে ঢুকল।

মা বিছানায়। পায়ের শব্দেও চোখ খুলল না। শুয়ে আছে। চোখ বন্ধ করে।

বোধন মালিশ আর ক্রেপ ব্যাণ্ডেজ বার করল। "একটা মালিশ এনেছি। লাগিয়ে দেখো।"

সুমতি তাকালেন। মুখ ঘুরিয়ে ছেলেকে দেখলেন। "মালিশের কথা কে বলল?"

"সকলেই বলল। এটা খুব ভাল। লাগাও, ব্যথা কমে যাবে।"

"ওষুধ খেয়েছি হোমিওপ্যাথি। অফিসে বলল।"

"তবু তুমি লাগাও। চুয়া গরম জল করছে। আগে একটু সেঁক দিয়ে নাও। দিয়ে লাগাও। বেশি রগড়ো না। আস্তে আস্তে মালিশ করো। তারপর হট ওয়াটার ব্যাগ দিয়ে রাখো। ব্যথা কমে যাবে।"

সুমতি শুয়েই থাকলেন।

বোধন ব্যাণ্ডেজ দেখাল। বলল, "কাল অফিস যাবার আগে এটা পায়ে বেঁধে নিও। আরাম পাবে।"

"আরাম?" সুমতি বিরক্তিকর মুখ করলেন, "আরামের কপাল নিয়েই এসেছি! যা আরাম দিচ্ছ তোমরা!"

বোধন মাকে চটাতে চাইছিল না। বেশি কথাবার্তা মার সঙ্গে বলা যায় না। কিসের থেকে কী হয়ে যায় কে বলবে! কম ঘাঁটানোই ভাল।

বোধন চলে আসছিল। সুমতি যন্ত্রণার শব্দ করতে দাঁড়াল। মার পায়ের দিকটা দেখল। মা এমনিতেই গুছিয়ে শোয় না। আজ কাপড় চোপড়ের কোনো ঠিক নেই। গোড়ালির অনেক ওপর পর্যন্ত কাপড় উঠে রয়েছে, ফোলা ফোলা পা। ডান পায়ের গোড়ালির ওপর চুন হলুদ মাখানো। মনে হল, পায়ের পাতা বেশ ফুলে আছে।

বলবে না বলবে না করে বোধন বলল, "একবার দেখিয়ে নিলে হত ?"

"থাক…" সুমতি আরও বিরক্ত।

"না, অনেক সময় হাড়টাড়ে চিড় ধরে যায়", বোধন বলল, "কি সব ছিঁড়ে যায় শুনি। ভোগায়।"

"সে তোমাদের হয়, সুখের শরীরে। আমার হাড়ে কিছু হয় না। আর হলেই বা কি ! খাটের ওপর পা তুলে বসে থাকতে তো পারব না। যেমন বরাত করে এসেছি তেমন করেই তো থাকতে হবে।"

বোধন চুপ করে থাকল। মার কথার পিঠে কথা বলা মুশকিল। বোবা থাকাই ভাল। বিনুদের বাড়ি থেকে পঞ্চাশটা টাকা আজ পেলে বোধন বলতে পারত, চলো—কাল তোমায় ডাক্তারখানায় নিয়ে যাচ্ছি। কাল যদি টাকা পায় বোধন মাকে বলবে। দশ পনেরো টাকা যায় যদি যাক, তবু একবার দেখিয়ে নেওয়া ভাল। জংলীর ঠিক এইরকম পা মচকে গিয়েছিল বাস থেকে নামতে গিয়ে—, শেষ পর্যন্ত প্লাস্টার করে রাখতে হল মাসখানেক।

বোধন চলে আসছিল, সুমতি বললেন, "পরের বেগার খাটছ, নিজের বাড়ির বেগার খাটতে পার না ? এই পাখাটা কদিন ধরে গরুর গাড়ির মতন চলছে। চলতে চলতে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেরে দিলেও তো পার। গরমে মরি। ঘুম হয় না রাত্তিরে।"

পাখাটা বোধন দেখেছে। সুকুমারদাও দেখে গিয়েছে। এ-পাখা

সারার নয়। সারাতে গেলে যা খরচ হবে তাতে ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যাবে। অনেককালের পাখা। ঠেকা দিয়ে দিয়ে এতকাল চলেছে। আর চলবে না।

বোধন কান চুলকোলো। "সারাতে গেলে অনেক খরচা পড়বে। সুকুমারদার ওখানে হবে না।"

"যেখানে হবে সেখানে যাও। বাড়ির কাজ করতে বললেই তোমাদের সকলের মুখে এক বুলি, হবে না, হচ্ছে না। অকর্মার ধাড়ি যত!"

বোধন জবাব দিল না কথার। দিয়ে লাভ নেই। মা কিছু বোঝে না, বুঝবে না।

চুয়া এল। হাতে গরম জলের ব্যাগ।

সুমতি উঠে বসলেন। দু পা দু পাশে ছড়ানো। পিঠে কাপড় নেই; গায়ের আঁচল কোমরের কাছে জমে আছে। মোটা মোটা হাত, ঘাড়-পিঠ কুঁজো মতন, পেট কী বিশ্রীভাবে ফুলে আছে। এত চর্বি মার হয় কেমন করে। এ সবই জল। জলভরা শরীর।

চুয়া বিছানার কাছে দাঁড়াল। "দিয়ে দেব?"

"দাও।" সুমতি পিঠের ওপর ছড়ানো এলো চুল জড়িয়ে নিতে বললেন।

বোধন আর দাঁড়াল না। বাইরে এল। বাবা একইভাবে বসে। ডান হাতে পেনসিল, বাঁ হাতে বিড়ি। বিড়ি হাতে বাবা কাগজের দিকে তাকিয়ে আছে। ভাবছে। কী ভাবছে বাবা বোধন জানে। বাবা ক্রস ওয়ার্ডের শব্দ মেলাচ্ছে, 'মোর' না 'সোর', 'ম্যারি' হবে না 'ক্যারি' হবে, অথবা 'হাউস' না 'মাউস'? একটা লোক সারাদিন বসে বসে এই সব করছে। শব্দ সাজাচ্ছে মেলাচ্ছে। এটা না ওটা করছে! ক্রস ওয়ার্ড না থাকলে অঙ্ক মেলাবার ধাঁধা। বাবা কত রকম খোঁজই

রাখে এই সব 'পাজল'-এর। রাখে, কারণ বাবার ধারণা একদিন, নিশ্চয় একটা সলিউসান লেগে যাবে, লেগে গেলেই বরাত খানিকটা ফিরে যাবে। ক্রস ওয়ার্ড ছাড়াও বাবা মাঝে মাঝে লটারির টিকিট কেনে। কোথাও কোনো টাকার গন্ধঅলা কিছু চোখে পড়লেই বাবা তাতে লেগে পড়ে। মা গালাগাল দেয় নিত্য। গালাগাল খেয়েও এইভাবে লেগে আছে বাবা। অন্য কোনো উপায় খুঁজে পায় না মানুষটা। অথর্ব, অক্ষম মানুষ আর কি করতে পারে! বাবা রাস্তায় বেরুতে পারে না, ঘুরতে পারে না, ঘরে বসে বসে টাকার স্বপ্ন দেখা ছাড়া আর কি করবে! মাঝে একবার খেয়াল চেপেছিল টাইপ করবে বাড়িতে বসে তাতে যা দু চার টাকা হয়। পুরোনো একটা টাইপ মেশিন কিনে দেবার জন্যে মাকে অনেক বলেছিল। মা দেয় নি। টাকা কোথায় পাবে মা? তাছাড়া ঘরে বসে টাইপের কাজ চলে না। কে আসবে তোমায় বাড়ি বয়ে টাইপ করতে দিতে!

প্যাণ্ট জামা ছাড়ার জন্যে বোধন পাশের ঘরে গেল। এ-বাড়িতে দুটো ঘর। একটা মা-বাবার, অন্যটা তাদের। তাদের মানে বোধন আর চুয়ার। অবশ্য ঘরটায় বোধনের দাবী থাকলেও দখল নেই। প্যাণ্ট, শার্ট, লুঙ্গি, গামছা—এই যা রাখতে পারে বোধন, নিজের এক সময়কার পুরোনো দু একটা বই বা টুকটাক, তা ছাড়া আর কিছু নয়। বোধন এ-ঘরে থাকতে পারে না। থাকা সম্ভব নয়। জায়গা নেই।

জামা খুলে প্যাণ্ট ছাড়ল বোধন। লুঙ্গি পরল। তারপর গামছা টেনে নিয়ে বাথরুমে চলে গেল।

হাত মুখ ধুয়ে বোধন বাথরুম থেকে আসছে, বাবা ডাকল, নীচু গলায়। এমন করে ডাকল যেন মার কানে না যায়। দাঁড়াল বোধন।

"দাশুবাবুকে মনে আছে?"

বোধন মনে করতে পারল না। কে দাশুবাবু? কোথায় থাকে? মাথা নাড়ল বোধন।

"দাশরথিবাবু! কালোমতন দেখতে। লম্বা। ছড়ি হাতে ঘুরতেন। কবিরাজ।"

বোধন মনে করতে পারল। "কারবালা ট্যাংক লেনের কাছে থাকতেন?"

"হ্যাঁ। কাল একবার যাও না কবিরাজমশাইয়ের কাছে।"

বোধন কিছুই বুঝল না। হঠাৎ কবিরাজের কাছে কেন যাবে!

"কবিরাজমশাই একটা মালিশ-তেল দিতেন। আমায় একবার দিয়েছিলেন। হাত মচকে ফেলেছিলাম। গাছগাছড়া দিয়ে তৈরী। তেলের নামটা ঠিক মনে নেই আমার। খুব ভাল ওষুধ। তখন বোধ হয় দেড় কি দু টাকা দাম ছিল। এখন একটা টাকা বাড়তে পারে। দু দিন লাগালেই পায়ের ফোলা ব্যথা সব সেরে যাবে।"

বোধন এতক্ষণে বুঝতে পারল। অবাক হয়ে দেখল বাবাকে। মানুষটা পাগল না অন্য কিছু! কোন দাশরথি কবিরাজ, কোনকালে বাবা তাকে চিনত, তার মালিশ আনতে ছুটতে হবে বোধনকে।

"মালিশ আমি এনে দিয়েছি," বোধন বলল।

"কী মালিশ?"

নাম বলল বোধন।

সন্দিগ্ধ হলেন শিবশঙ্কর। "ওতে কি কাজ হবে? তার ওপর তোমার মার পায়ে একজিমা ছিল। বেড়ে না যায় অ্যালপ্যাথিতে! অনেক সময় আয়োডিন কম্পাউণ্ড মিশিয়ে দেয় মালিশে। একজিমা থাকলে ক্ষতি হয়।"

বিরক্ত হল বোধন। "দু একদিন দেখা যাক। তাতে আর কি বাড়বে!"

"কবিরাজমশাইয়ের তেলে বাড়ত না। উপকার হত চট করে।"

"পরে দেখব।"

বোধন আর বাবার সামনে দাঁড়াতে চাইছিল না।

শিবশঙ্কর কিছু বললেন না আর।

মুখ মুছতে মুছতে বোধন ঘরে এল। বাবা যে কোন জগতে থাকে কে জানে! কোথাও কিছু নেই দুম করে দাশরথি কবিরাজের কথা খেয়াল হল। লোকটা এতদিন বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে জানে! বোধনরা যখন মানিকতলায় থাকত, সারকুলার রোডের গা ঘেঁষে, লাহাবাবুদের ফ্ল্যাট বাড়িতে—তখন কবিরাজমশাইকে সে দেখেছে। তখনই বেশ বয়েস কবিরাজমশাইয়ের। বাবার সঙ্গে আলাপ পরিচয় ছিল। আজ বছর পাঁচেক হল বোধনরা মানিকতলা ছাড়া। কবিরাজ-মশাইয়ের কেউ কোনো খবর রাখে নি। হঠাৎ তাঁর কাছে এক শিশি মালিশ তেলের জন্যে কেন যাবে বোধন! ও-সব কবিরাজীটবিরাজীতে বিশ্বাস নেই বোধনের। সে যে-মালিশটা এনে দিয়েছে তাতেই বোধহয় সেরে যাবে মা।

চুয়া ঘরে এল। তাকাল বোধন।

"মালিশটা লাগাল মা?" বোধন জিজ্ঞেস করল।

"লাগাবে পরে।"

"পায়ের ফোলা কালকের চেয়ে বেড়েছে না কমেছে রে?"

"কি জানি আমি কিছু বুঝলাম না!" চুয়া বিরক্ত। "এমনিতেই মরছি, তার ওপর এই এক উপসর্গ হল।"

বোধন অসন্তুষ্ট হল। চুয়া আজকাল মার ব্যাপারে গা লাগায় না। যেন মার কী হল না হল তাতে তার আসে যায় না।

"তুই কিছুই বুঝিস না? মেয়ে হয়েছিস কেন?" বোধন বলল।

"হয়েছি তো কি হয়েছে! আমার ইচ্ছেয় হয়েছি! তুমিও তো ছেলে হয়েছ।"

বোধন কি যেন বলতে যাচ্ছিল। রীতিমত রেগেই। বলতে গিয়েও হঠাৎ থেমে গেল। চুয়া কি যেন বলল? 'আমার ইচ্ছেয় হয়েছি—?' কথাটা কানে বিশ্রী শোনাল। নোঙরা লাগল। কিন্তু কথাটা মিথ্যে নয়। চুয়া চুয়ার ইচ্ছেয় হয় নি, বোধনও। নিজের ইচ্ছেয় মার ছেলে মেয়ে হয়ে তারা জন্মায় নি। নিজের ইচ্ছেয় জন্মাতে পারলে চুয়া কার মেয়ে হয়ে জন্মাত?

বোধন অন্যমনস্কভাবে বোনের মুখ দেখছিল।

চার

কড়া নাড়ার শব্দে বোধনের ঘুম ভাঙল। জবাদি এসে কড়া নাড়ছে। সকাল হয়েছে। ভোরের দিকেই আসে জবাদি, রোদ ওঠার আগে।

বোধন উঠল। মশারি সরিয়ে বাইরে আসতেই বুঝল, জবাদি ঠিক সময়ে এসেছে, আলো এ-সময়ে যেমন হয় তেমন।

দরজা খুলে দিল বোধন।

জবা ভেতরে এল। পায়ের চটি খুলে এক কোণে রাখল, রেখে মাথা নীচু করে মশারির দড়ির তলা দিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল।

বড় বড় হাই তুলল বোধন। হাত মাথার ওপর তুলে ডাইনে বাঁয়ে হেলে আড়মোড়া ভাঙল। ক্যাম্প খাটে শুয়ে শুয়ে ঘাড় পিঠ মেরুদণ্ড বেঁকে গেল কিনা কে জানে। সকালের দিকে রোজই পিঠ ব্যথা করে।

চোখে ঘুম থাকলেও বোধন আর শোবার চেষ্টা করল না। মশারির দড়ি খুলতে লাগল। দড়ি খুলে বিছানা গুটিয়ে নেবে। তারপর ক্যাম্প খাট। ক্যাম্প খাটটা ভাঁজ-করা, ফড়িংয়ের মতন পা। এটা ওটা খুলে, দুমড়ে, ভাঁজ করে গুটিয়ে নিলেই ছোট হয়ে যায়।

বোধন তার বিছানা গোটাতে লাগল।

জবা রান্নাঘর থেকে এঁটো বাসনপত্র বার করে বাথরুমে নিয়ে যাচ্ছে। বাসন-কোষণ বার করা হয়ে গেলেই উনুন ধরিয়ে দেবে। দিয়ে রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করবে। তাতেও রক্ষে নেই, ফাঁক দিয়ে

ধোঁয়া এসে এই জায়গাটা ধোঁয়াটে করে তুলবে।

এক একজনের হাত পা খুব চটপটে হয়। জবাদিরও সেই রকম। উনুন ধরিয়ে কিছু বাসনপত্র—তখনকার মতন যা লাগবে—মেজেঘষে তুলে দিতে তার বেশীক্ষণ লাগবে না। এইটুকু সেরে জবাদি নীচের তলায় ঝুমুরদের বাড়িতে কাজ করতে নেমে যাবে, আবার ওপরে আসবে ঘণ্টা দেড়েক পরে।

এই সময়টুকু বোধনদেরও দরকার। জবাদি প্রথম দফার বাসন তুলতে না তুলতেই চুয়া উঠবে, উঠে পড়িমড়ি করে বাথরুমে ছুটবে। চুয়া বেরিয়ে আসতে না আসতেই বাবা। ততক্ষণে মা উঠে পড়বে।

বাড়ির সবাই জেগে ওঠার পর যা কিছু করণীয়—বসা, চা খাওয়া, তরকারি কোটা, মাথার চুলের জট ছাড়ানো—আরও কত কি—সবই প্রায় এই জায়গাটুকুতে। এটা অবশ্য খাবার জায়গা। হাত কয়েক মাত্র লম্বা-চওড়া। উত্তর দিকে একটা জানলাও রয়েছে। জানলা আর দেওয়াল ঘেঁষে সস্তা কাঠের ছোট টেবিল। টেবিলের ওপর প্লাস্টিকের শিট। গোটা তিনেক চেয়ার, একটা হাতলঅলা—অন্য দুটো মামুলী। সংসারের আরও টুকিটাকি এখানে জমা হয়েছে, তেল চিটচিটে মিটসেফ, লকপকে একটা র‍্যাক আনাজের ঝুড়ি, বঁটি।

রাত্রে বোধনকে এখানেই শুতে হয়, ক্যাম্প খাট পেতে। রাত্রে সবার সব কিছু সারা হয়ে গেলে শোও, আর সকালে সবার আগে ওঠো। বোধন উঠে ক্যাম্প খাট না তুললে হাঁটা চলার জায়গা থাকে না। রাত্তিরে চুয়া, মা কিংবা বাবা যখন বাথরুমে যায়—বোধনের টাঙানো মশারির দড়ি মাথার ওপর তুলে গলে যায়, এতে অনেক সময় টান পড়ে বোধনের মশারি খুলে যায়, মশা ঢোকে, ঘুম ভেঙে যায় বোধনের।

এই রকমই চলছে আজ চার পাঁচ বছর। উপায় কি! জায়গা

কই এ-বাড়িতে ? তুটি মাত্র তো ঘর। ছোট ছোট। মা-বাবার ঘরে জায়গা নেই। দু জনের মতন একটা গোবদা খাট, কাঠেরই এক আলমারি, বাক্স তোরঙ্গ— ! জায়গা কি মাটি ফুঁড়ে গজাবে ! চুয়ার ঘরেও তাই। সংসারের দশ রকম জিনিস তার ঘরে। কাজের অকাজের। ছোটখাট একটা তক্তপোশে শুয়ে থাকে চুয়া।

এ-বাড়িতে এসে বোধন প্রথম প্রথম ঘরে জায়গা করে নিয়েছিল। চুয়াকে ঠেলাঠেলি করে একপাশে সরিয়ে দিত। চুয়া তার গায়ে পা তুলে দিয়ে দিব্যি ঘুমোত। মাঝে-সাঝে বোধন বোনকে গুঁতো মেরে খাট থেকে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু সেই চুয়া আর নেই তার তেরো-চোদ্দ বছর বয়েস এখন কুড়িতে এসে ঠেকল। আর দেখতে দেখতে বোধন হল বাইশ।

উপায় নেই, জায়গা নেই বলে বোধনের এখানে শোওয়া, ভাঁজ-করা তুমড়োনো ক্যাম্প খাটে। ভাল লাগে না। লাগার কথাও নয়। গরমে ভেপসে মরো, পুরোনো টেবিল পাখাটা আর চলে না, বাতাসও আসে না উত্তরের জানলা দিয়ে, সারা রাত ঘেমে মরা। বর্ষায় সব সেঁতসেতে, বাড়ির যত-রাজ্যের না-শুকোনো শাড়ি সায়াও এখানে মেলে দেয় ওরা ; সেই ভিজে কাপড়ের স্যাঁতসেতানির সঙ্গে তার দুর্গন্ধও নাকে নিয়ে ঘুমোতে হয় বোধনকে। আর শীত হলে তো কথাই নেই, কী কনকনে ঠাণ্ডা, হবে না কেন ? সারাদিনে রোদ ঢোকে এখানে, পড়ন্ত বেলায় যা ছিটেফোঁটা রোদ। মানুষের শোবার তন জায়গা এটা নয়। গণ্ডা গণ্ডা আরসোলা উড়ছে, দেওয়ালে টিকটিকি বাড়ছে, বাথরুম থেকে অনবরত দুর্গন্ধ আসছে ভেসে। এখানে াতের পর রাত কেউ শুতে পারে না। তবু বোধনকে শুতে হয়।

মানিকতলা ছেড়ে আসার পর থেকেই শোওয়া-বসার আরাম ফুরিয়ে গিয়েছে। বোধনরা আগে মানিকতলায় থাকত। সারকুলার

রোড ঘেঁষে। লাহাবাবুদের ফ্ল্যাট বাড়িতে। দোতলা-তেতলা মিলিয়ে। তেতলায় একটা বড়সড় ঘর, পাশে খোলামেলা খানিকটা চাতাল, একদিকে রান্নাঘর, অন্যদিকে জলের ট্যাংক, বাথরুমও ছিল টিনের দরজা দেওয়া। স্নানের ব্যবস্থা তেতলায় ছিল না। বরং বারণ ছিল। সে-বারণ অনেক সময় মানা হত না। স্নানের ব্যবস্থা ছিল দোতলায়। দোতলায় পাশাপাশি দুটো ঘর। আর-একটা খুপরি মতন, ভাঁড়ার-টাঁড়ার রাখো। তারই গায়ে ঢাকা বারান্দা আর বাথরুম। বারান্দায় কল ছিল স্নান-টানের জন্যে। তবে পুবের দিকটা ছিল খোলামেলা। বড় বড় টিনের জানলার মতন ব্যবস্থা ছিল পুব দিকে। মেয়েরা স্নানের সময় সেটা টেনে ভেজিয়ে দিত। ঝড়জলেও বন্ধ রাখতে হত জানলাগুলো। শীতের হাওয়া বইলেও।

তেতলায় থাকত মা-বাবা। দোতলার দুটো ঘরের একটাতে দিদি আর চুয়া, অন্যটাতে বোধন। তখন সবই বাড়তি ছিল। মানে বাড়তি হয়ে গিয়েছিল। লাহাবাবুদের এই রকম দশ বারোটা ভাড়া বাড়ি। নীচের তলায় এক ভাড়াটে, দোতলা-তেতলা মিলিয়ে অন্য-এক। বাবা বাড়িটা ভাড়া নেয় সংসার বড় হয়ে উঠেছিল বলে। শোভাবাজার থেকে মানিকতলা। ঠাকুমা তখন বেঁচে, পিসীমা বিধবা হয়ে ভাইয়ের কাছে এসেছিল মেয়ে নিয়ে। ততদিনে বোধনরাও সবাই মোটামুটি বড়সড়। লাহাবাবুদের বাড়ি পাওয়া খুব শক্ত। সবাই পুরোনো ভাড়াটে, আশি একশো টাকায় শেকড় গেড়ে বসে আছে। কখনো সখনো দু একজন উঠত। বাবার ব্যাংকের একজন বাড়ি ছাড়তেই বাবা সেটা ধরে ফেলল, অবশ্য লাহাবাবুদের সরকারমশাইকে হাত করে। সেই বাড়িতে কত কি হল পর পর। ঠাকুমা মারা গেল। পিসীমা মেয়ে নিয়ে শেষ পর্যন্ত শ্বশুর বাড়ি অণ্ডালেই ফিরে গেল। বাড়ি তখন থেকেই ফাঁকা। অঢেল জায়গা।

সুখের দিন বলতে সেই সময়টা। বাবা চাকরি করছে ব্যাংকে। পকেটে যেন লক্ষ্মী বাসা বেঁধেছিল। দশ পঁচিশ টাকা কিছুই নয়। বাবা খানিকটা শৌখিন গোছের মানুষ ছিল। মা ভাল শাড়ি জামা পরত, গয়না থাকত গায়, ভাল জরদা দেওয়া পান খেত, বাবার সঙ্গে রিকশা চড়ে থিয়েটার সিনেমা দেখতে যেত শ্যামবাজারে। এমন তরতরে জীবনটা হঠাৎ পালটে গেল। কোন দিক থেকে একটা কালো মেঘ ধীরে ধীরে এসে সব তছনছ করে দিল। কোনোদিনই আর ভোলা যাবে না বাবার যা হয়েছিল। ট্রাম ধরতে গিয়ে পড়ে পায়ের ওপর দিয়ে চাকা চলে গেল। হাসপাতালে কত কাল যে! বাঁচবে কি মারা যাবে বাবা কিছুই ঠিক নেই। একটা পা—বাঁ পা হারিয়ে বাবা বাড়ি ফিরল। সেই সঙ্গে মেরুদণ্ড আর কোমরের কাছে কিসের গণ্ডগোল। হাঁটা চলা গেল। চাকরিও আর নেই, থাকলেও কি বাবা আর অফিস যেতে পারত। আসলে বাবা একটা গণ্ডগোলে পড়ে গিয়েছিল আগেই, চাকরি যাব-যাব করছিল, ব্যাংক বাবাকে সাসপেণ্ড করেছিল। ভীষণ দুশ্চিন্তায় ছিল বাবা, উকিলবাড়ি ছুটোছুটি করছিল। ওই রকম মানসিক উদ্বেগের সময়, প্রচুর উৎকণ্ঠা নিয়ে তাড়াহুড়ো করে কাগজপত্র সমেত উকিলবাড়ি ছুটতে গিয়েই ট্রামের পা-দানি থেকে পা পিছলে পড়ল।

অতবড় দুর্ভাগ্য এসেছিল বলেই বাবা খানিকটা বেঁচেও গেল। ব্যাংক বাবাকে যতটা পারল মায়া-দয়াও দেখাল। চাকরি অবশ্য গেল। কিন্তু যেখানে যা পাওনা ছিল মিটিয়ে দিল।

বাবার চাকরি যাওয়া আর পা-কাটা পড়া মানে মাথার ওপর সমস্ত আকাশ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়া। বাড়িতে তখন টাকা-টাকা করে মা মাথা খুঁড়ছে। বাবার যা ছিল শেষ, মার যেখানে যেটুকু সোনাদানা ছিল তাও প্রায় ফুরিয়ে গিয়েছে। চতুর্দিকে ধার, ধার

ধার। মুদিখানায়, বাজারে, ওষুধের দোকানে পাড়াপড়শীর কাছে। লজ্জায় মাথা নীচু করে পাড়ায় ঘুরতে হত। বাড়ি ভাড়া বাকী পড়তে পড়তে বছরে গিয়ে ঠেকল। লাহাবাবু বললেন, ভাড়া চাই না; বাড়ি ছেড়ে দিন।

দিন বললেই কি বাড়ি ছাড়া যায়? মা তখন হন্যে হয়ে কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছে। মায়ের লেখাপড়া বলতে স্কুল ফাইন্যাল। কোনো রকমে। তাও কোন কালে। সবই ভুলে গেছে। থাকার মধ্যে হাতের লেখা। গোটা গোটা, পরিষ্কার। ওতে চাকরি হয় না। তার ওপর মায়ের বয়েস হয়ে গিয়েছিল; তিন ছেলেমেয়ের মা। মায়ের অবশ্য হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। এর জন্যে মায়ের উদ্যম যতটা—প্রায় ততটাই তার দুর্ভাগ্যের কাহিনী। কুমুদকাকা বলে বাবার এক বন্ধুও পেছনে ছিল। মা চাকরি পেল সরকারী এক দোকানে। কাপড়চোপড়, পুতুল, মুখোশ-এটাওটা বিক্রী হয়।

মা চাকরি পেয়ে একটু-আধটু গুছিয়ে নেবার আগেই দিদি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল। যার সঙ্গে পালাল তাকে বোধনরা চিনত। বদ্যিনাথ। কোন কারখানায় কাজ করত। দিদির সঙ্গে বদ্যিনাথের মেশামেশি চলছিল অনেকদিন ধরেই, তবু একেবারে এতটা হবে মা বোঝে নি। চেঁচামেচি, ঝগড়াঝাটি করে মা ধাক্কাটা সামলে নিল। সংসারে একজন লোক কমল। সেই যে দিদি চলে গিয়েছিল তারপর আজ পর্যন্ত তার কোনো খবর কেউ জানল না। দিদি চলে যাবার হপ্তা খানেক পরে একটি মাত্র পোস্টকার্ড এসেছিল, পেনসিলে লেখা। আঁকাবাঁকা করে দিদি লিখেছিল, তারা বিয়ে করেছে। তোমরা ভেব না।

না, কেউ আর ভাবে নি। বোধনের তো তাই মনে হয়। কী হবে ভেবে? সে কোথায় কেউ তো জানে না। বেঁচে আছে না মরে

গিয়েছে—তাই বা কে বলবে !

দিদি পালিয়ে যাবারও চার পাঁচ মাস পরে এই বাড়িতে উঠে আসতে হল। মা লেগে থেকে থেকে, এর ওর হাতে-পায়ে ধরে বাড়িটা জোটাল। সরকারী হাউসিং। ভাড়া কম। ভাড়ার জন্যে মাথার ওপর বাড়িঅলা বসে নেই। রোজ তাগাদাও দিচ্ছে না।

মা কেমন আশ্চর্য ভাবে মানিয়ে নিল এই বাড়িটার সঙ্গে। বাবার মানিয়ে নেওয়া না-নেওয়ার কথাই নেই। অক্ষম, পঙ্গু মানুষ। যেখানে থাক—সবাই সমান।

বোধন প্রথম প্রথম কিছুতেই এই পাড়া, এই বাড়ির সঙ্গে নিজেকে মানাতে পারত না। মানিকতলায় যেন তার নাড়ী পোঁতা ছিল। বন্ধুবান্ধব, স্কুল, কলেজ, পাড়ার আড্ডা, মানিকতলার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা, ছায়া সিনেমা, বিডন স্ট্রীটে মধুদার চায়ের দোকান, তাদের পাড়ার কালী পুজো, সরস্বতী পুজো—সমস্ত যেন মনের সঙ্গে পাকে পাকে জড়ানো ছিল। তেরো চোদ্দ বছর একটানা থাকার পর পাড়া ছেড়ে চলে আসা। বোধনের কান্না পেত। বুক টনটন করত। তবু তাকে আসতেই হল। না এসে উপায় কি !

এখানে এসে সে প্রথম প্রথম মানিকতলায় ছুটত। সেই ছোটা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। রোজ অত বাসভাড়া কে দেবে ? মাঝে-মাঝে এক আধদিন এখনও যায়। খুব কম। এখানে থাকতে থাকতে তার সবই সয়ে গিয়েছে। বন্ধুবান্ধবও জুটেছে। দিন কেটে যাচ্ছে বৈকি। কোন জিনিস না সয়ে যায় মানুষের ! বাবা মাত্র একটা পা নিয়ে এই ঘরের মধ্যে বসে জীবন কাটাচ্ছে। মা, যে-মানুষ বরাবর সংসার, রান্নাবান্না, কাপড়কাচা, ছেলেপুলে আগলে দিন কাটিয়েছে—সেই মানুষ আজ সকাল ন'টা সাড়ে ন'টা বাজতে না বাজতেই নাকে-মুখে গুঁজে থলথলে শরীর নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ছোটে, ফিরতে

ফিরতে সেই সন্ধে সাত আট—কিছুই ঠিক নেই। কলকাতা গাড়িঘোড়া ধরে বাড়ি ফেরার কি কোনো ঠিক আছে।

বোধনও তো সবই মেনে নিয়েছে, সয়ে যাচ্ছে। এই যে সারা বছ নিত্যদিন খাবার জায়গাটুকুতে ক্যাম্প খাট পেতে শুয়ে থাকা যেখানে কোনো হাওয়া আসে না বাইরের, ফর ফর করে সারা রাত আরসোলা ওড়ে, টিকটিকি ডাকে, ময়লা কাপড়ের, নোঙরা বাথরুমে গন্ধ আসে, সেখানেও তো বোধন কেমন ঘুমিয়ে থাকে। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নও দেখে, মন্দ স্বপ্ন, ভাল স্বপ্ন—তু রকমই।

আজ সে বাবাকে নিয়ে একটা খারাপ স্বপ্নই দেখেছিল। শে রাতে। তখনই ঘুম ভেঙে গেল। তারপর আর ভাল করে ঘুম হয় নি পাতলা ছেঁড়া-ছেঁড়া ঘুম ছিল। জবাদি কড়া নাড়তেই আজ সে সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেয়েছে। শোনামাত্র উঠেছে। উঠে দরজা খুলে দিয়েছে।

বিছানাপত্র তোলা হয়ে গিয়েছিল বোধনের। ক্যাম্প খাটও ভাঁজ করে গুটিয়ে ফেলল।

রান্নাঘরের ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া আসছে। এই জায়গাটা এখন বেশ কিছুক্ষণ কয়লার ধোঁয়ায় ভরে থাকবে। সাত সকালে ধোঁয়া নাকে মুখে গেলে কাশি লাগে। বোধন উত্তরের জানলাটা খুলে দিল। যত তাড়াতাড়ি ধোঁয়া বিদেয় হয়।

জানলা খুলতেই উলটো দিকের বাড়ির বন্ধ দরজা জানলা, ময়লা পাইপ, নীচের মাঠে আবর্জনার গাদা চোখে পড়ল। এত সকালেও একজোড়া কুকুর ছোটাছুটি শুরু করেছে।

দরজা খুলে চুয়া বেরুলো। তাকাল বোধন।

বাসী মুখ, এলোমেলো চুল, পায়ের দিকে চিট সায়া, একটা আ

ছেঁড়া শাড়ি আলগাভাবে জড়ানো, চুয়া বাথরুমের দিকে যাচ্ছিল।

জবা বাসন মাজছে কলঘরে।

চুয়া বাথরুমের দরজা পর্যন্ত গিয়ে ছটফটে গলায় বলল, "তোমার দরি হবে, জবাদি?"

জবা কি জবাব দিল শোনা গেল না।

চুয়া হাই তুলতে তুলতে টেবিলটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বিরক্ত মুখ। দু একবার শব্দ করল বিরক্তির।

"জবাদি এত দেরি করে আজকাল—" চুয়া বেশ অসহিষ্ণু।

"দেরি কোথায়, ঠিক সময়েই এসেছে," বোধন বলল।

একটু চুপচাপ। চুয়া মাথা চুলকে নিল। "এই যে ছাই একটা বাথরুম—পারা যায় না।"

বোধন কিছু বলল না। দোমড়ানো ক্যাম্প খাটটা চুয়ার তক্তপোশের তলায় রেখে আসতে হবে। বিছানা ঘরের কোণে বাক্সর ওপর।

"কাল রাত্তিরে অত হই হই হচ্ছিল কিসের?" চুয়া বলল।

"কখন?"

"অনেকটা রাত্তিরে। সি ব্লকের দিকেই মনে হল।"

"আমি কিছু শুনি নি। চারদিক বন্ধ, এখানে কিছু শোনা যায় না।"

চুয়া কাশল, আবার মাথা চুলকালো। "চোর ধরেছিল বোধ হয়।"

জবা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। চুয়া যেন সারাক্ষণ চোখ রেখেছিল, জবা বেরিয়ে আসতেই ধড়মড় করে এগিয়ে গেল।

"জবাদি?"

"বলো।"

"বাসনগুলো একপাশে সরিয়ে রাখলাম।" দরজা বন্ধ করা শব্দ হল।

বোধন তার গোটানো বিছানা আর খাট নিয়ে ঘরে ঢুকল জানলার একটা পাট বন্ধ। চুয়া বন্ধ করে শুয়েছিল, না বন্ধ হ গিয়েছে নিজের থেকেই কে জানে! কার্তিক মাস শেষ হল। ঠাং মোটেই পড়ে নি।

যেখানে যা রাখার রেখে বোধন জানলাটা ভাল করে খুলে দিল এদিকের জানলা খুললে মাঠ, জলের ট্যাংক, পাঁচিল ডোবা এইস চোখে পড়ে। দূরে বস্তি, পাঁচিলের ওপাশে, কবেকার এক ভাঙচোরা বাগানবাড়ি, কলোনি। আজ আর আকাশ ঘোলা নয়। রোদ উঠছে।

বোধন চোখ সরিয়ে ঘরের মধ্যে একবার তাকাল। ভা তোরঙ্গ, চালের টিন, অচল রেডিয়ো, পুঁটলি বাঁধা পুরোনো তুলে কৌটোবাটা, কাচের বয়াম, ঝুড়ি, জুতোর বাক্স, মায় একটা ইঁদু মারা কল।

বোধন ব্রাশটা তাক থেকে তুলে নিল। ব্রাশটার কিছু আ নেই, দাঁত মেজে মেজে ছেতড়ে গিয়েছে, ডাঁটিটাও বাসী হলুদের মত রঙ ধরেছে।

বাইরে এল বোধন। জবাদি রান্নাঘরের দরজা খুলে দিয়েছে রান্নাঘরের বন্ধ ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। তবে ধোঁয়া এখন পাতলা।

তাকের ওপর মাজনের কৌটো। সস্তা মাজন। বলে আয়ুর্বে মাজন। বাঁ হাতে খানিকটা মাজন ঢেলে নিয়ে বোধন দাঁত মাজ শুরু করল ব্রাশ দিয়ে। ব্রাশটা এবার ফেলে দিয়ে আঙুল চালা হবে। একটা ব্রাশ কিনতে ক পয়সা! তবু কেনা হচ্ছে না।

জবাদি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। এক প্রস্থ বাসন রেখে, ান্নাঘর মুছে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। এবার ঝুমরুদের বাড়ি যাবে।

চলে যেতে গিয়ে দরজার কাছাকাছি থামল জবা। "দাদা আমার ঠি লিখে দিলে না?"

ব্রাশ চালাতে চালাতে মুখে থুতু নিয়ে বোধন বলল। "দেব। াজই লিখে দেব।"

জবাদি চলে গেল। বোধন দেখল। যখন আসে জবাদির পায়ে বারের ক্ষয়-যাওয়া চটি থাকে। এই যে এখন নীচে গেল, চটি রল না, রেখেই গেল। নীচের বাড়ির কাজ সেরে ওপরে আসবে, াকী কাজকর্ম সারবে, তারপর যাবার সময় চটিজোড়া পায়ে দেবে। বাধন এক-আধ বার ঠাট্টাও করেছে জবাদিকে—তোমায় বুঝি চটি ায়ে ওরা ঢুকতে দেয় না জবাদি? তাতে জবাদি যেন লজ্জা পেয়ে লেছে—'জলে জলে কাজ পায়ে কি রাখা যায়'!

জবাদি মানুষটা বড় ভাল। এই বাড়িতে তার কোথায় যেন এক ায়া পড়ে গিয়েছে। এক-পা কাটা খোঁড়া বাবু, অফিস-ছোটা মা, নিষ্কর্মা দুই দাদা দিদি—সব যেন কেমন মন্দ কপালের ব্যাপার। বাধ হয় জবাদির করুণা হয়। মমতাও। অন্তত বাবার ওপর জবাদির য করুণা বেশী সেটা বোঝা যায়। বাবাকে কখনোই ছেড়ে কথা বলে া মা। যখন তখন খোঁচা মারে। কারণে অকারণে চেঁচামেচি, ালমন্দ করে। বোধন দেখেছে, মা যখন বাড়াবাড়ি শুরু করে, জবাদি চোখের ইশারায়, কখনো বা নীচু গলায় মাকে চুপ করতে বলে। মা অবশ্য পরোয়া করে না, কিন্তু জবাদিকেও তেমন কিছু বলে না! হয়ত স্বার্থের জন্যেই। পঁচিশ টাকা মাইনে আর দু বেলা দু কাপ চা, খান দুয়েক শুকনো রুটির বদলে জবাদির মতন কাজের লোক মা কোথায় পাবে! কাজ তো কম নয় জবাদির: বাসন মাজে, একবেলা শুধুই ঘর

ঝাঁট, অন্য বেলায় ঘর মোছা, মসলা বাটা, দায়ে-অদায়ে তরি-তরকারি কুটে দেওয়া, এমন কি রান্নাবান্নাতেও অল্প-স্বল্প সাহায্য। জবাদি ছাড় এত আর কে করবে!

চুয়া বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল।

বোধন মুখ ধুতে যাবার সময় দেখল, রান্নাঘরে উনুন ধরে গিয়েছে। চুয়া খেয়াল করে নি, চায়ের জল না বসিয়ে ঘরে চলে গিয়েছে চোখমুখ মুছে, কাপড় চোপড় ঠিক করে পরে আসতে। মার চোখে পড়লে গালাগাল খেত। মা এ-সব একেবারে দেখতে পারে না: উনুনের আঁচ নষ্ট হবে আর তুমি ঘরে দাঁড়িয়ে গাল মুছবে—কোন নবাবের বেটি তুমি। কেন, চোখ চেয়ে দেখতে পার না একটু। কয়লা কি বিনি পয়সায় আসে!

মা কথা শুরু করলে থামে না, একটা থেকে আর-একটায় লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যায়। বাড়ি ভাড়া, ইলেকট্রিক বিল, কয়লা কেরোসিন তেল, চাল, গম—পর পর মুখে এসে যায় মার। যায়, কেন না এ-সংসার মা চালায়, মার হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, গায়ের রক্তে তাদের খাওয়া-পরা।

বোধন মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এসে দেখল, চুয়া রান্নাঘরে। চায়ের জল চাপাচ্ছে।

খুট করে শব্দ হল দরজায়। বাবা। দরজা খুলে বেরিয়ে এল। বোধন মুখ তুলে বাবাকে দেখল।

বাঁ বগলে ক্রাচ নিয়ে বাবা কমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল। জানলার দিকে তাকাল। তারপর অভ্যেস মতন বলল, "বাথরুম ফাঁকা?"

"হ্যাঁ।"

বাবা একদিকে হেলে সামান্য দুলতে দুলতে বাথরুমে চলে গেল।

বোধন ঘরে গিয়ে ব্রাশ রাখল। মুখ মুছল। বাবার জন্যে বড় ক

হয় বোধনের। কষ্ট এবং ঘেন্না। কে বলবে এই বাবা সেই মানুষ! বছর ছয় আগেও বাবা স্বাভাবিক ছিল, সুস্থ ছিল। সেই সক্ষম, লম্বা চওড়া মানুষটা আজ কেমন অথর্ব, অক্ষম, দীন হয়ে গিয়েছে। দেখতেও নোংরা-নোংরা লাগে। মুখে দাড়ি জমে তিন চার দিন, তারপর একদিন সস্তা ব্লেডে দাড়ি কামাবার পরও মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি জমে থাকে, কোনোদিনই আর বাবার মুখ পরিষ্কার হয় না। মাথার চুল রুক্ষ, লালচে হয়ে গিয়েছে। ঘাড় কাঁধ কালো, ময়লা জমছে তো জমছেই। বাবার গলাও কেমন ভাঙ্গা ভাঙ্গা, জড়ানো শোনায়। গলার স্বর দিন দিন নীচু হয়ে যাচ্ছে, আজকাল প্রায়ই কথা বলতে গিয়ে তোতলায়। নিজের ওপর আর কোনো আস্থা নেই, কোনো কর্তৃত্ব নেই বলেই বোধ হয়। বাবার চোখ দেখলে বোধনের মনে হয়—মানুষটার চোখ ফাঁকা, মন ফাঁকা, গ্লানি আর লজ্জায় মরা-মরা, কুণ্ঠিত। বড় অসহায় আর অপরাধীর মতন দেখায় বাবাকে। আবার ঘেন্নাও হয়! কেন, কেন মানুষটা এ-রকম হল?

বোধন বাইরে এল। বাথরুমে বাবার গলা পরিষ্কারের শব্দ—বমি করার মতন।

বোধন টেবিলের একপাশে বাবার চেয়ারটা ঠিক করে রাখল। কাঠের চেয়ার। হাতল আছে। এই চেয়ারটায় বাবা বসে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে এখন বসবে, আর বেলা বারোটা পর্যন্ত একটানা এখানেই বসে থাকবে। দরকার না পড়লে বাবা উঠবে না। এই চেয়ার আর এই টেবিলটাই বাবার সব। সকাল থেকে বেলা পর্যন্ত এখানে, দুপুরে এক দু ঘণ্টা হয়ত নিজের ঘরে বিছানায়, তারপর আবার বিকেলের গোড়া থেকে রাত পর্যন্ত—যতক্ষণ না খাওয়া-দাওয়া শেষ হচ্ছে। এই কাঠের চেয়ার, ওই টেবিল আর সামনের জানলা-টুকুই বাবার জগৎ। কেমন জগৎ কে জানে! বোধন জানে না।

তবে মনে মনে বোঝে, এইটুকুর মধ্যে বাবা নিজেকে মানিয়ে নিতে নিতে আজ যেন খাঁচায়-পোরা জীবজন্তুর মতন নির্জীব হয়ে গিয়েছে।

বাবা বাথরুম থেকে বেরিয়ে নিজের জায়গায় এসে বসল।

বোধন রান্নাঘরে ঢুকল।

"চা হয়েছে রে?"

"ভিজিয়েছি।"

চুয়া একটা ভাঙ্গা কাপে গুঁড়ো দুধ গুলছিল। গুঁড়ো চা, গুঁড়ো দুধ, এক রত্তি চিনি—না থাকলে গুড়ের বাতাসা দিয়ে চা। এক বোতল হরিণঘাটা আগে আসত, অনেকদিন আগে, তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

"তোর কাছে," বোধন নীচু গলায় বলল, "টাকা পয়সা কিছু আছে?"

"টাকা! কেন?"

"মার গোড়ালিটা একবার সাহা ডাক্তারকে দিয়ে দেখিয়ে নিতাম ডিসপেনসারিতে গেলে চারটে টাকা নেবে।"

"না, আমার কাছে নেই।"

"একেবারে নেই?"

"যা আছে তাতে আমায় চালাতে হবে। বাবা গত হপ্তায় পাঁচটা টাকা নিয়েছে। বলেছিল দেবে। দেয় নি।"

"বাবা কোথা থেকে দেবে?"

"তা আমি কি জানি! মার কাছ থেকে চেয়ে দেবে।"

বোধন বোনের মুখ দেখল। অবাক হল না। চুয়া এই রকমই হয়েছে। স্পষ্ট, ঠোঁট কাটা, জেদী। আজকাল সে টাকা-পয়সা রোজগার করে। অল্পস্বল্প। একটু-আধটু গানের গলা ছিল ছোটবেলা থেকে। মানিকতলায় থাকার সময় একজন মাস্টারও ছিল কিছুদিন।

তারপর পাড়ার স্কুলে যেত। শেষে সব বন্ধ হয়ে গেলেও চুয়া নিজের মতন রেকর্ড রেডিয়ো শুনে-টুনে গান শিখত। এই করে করে শেষে, এখানে আসার পর একদিন চুয়া গেল থিয়েটার করতে। কোন ক্লাব নিয়ে গেল। তার পর থেকে ডাক পাচ্ছে। আজকাল মাঝেমাঝেই। টাকাও পায়।

বোধন মার গলা শুনতে পেল। উঠেছে। চুয়া তাড়াতাড়ি চা ঢালতে লাগল।

পাঁচ

বোধন দরজায় এসে দাঁড়াতেই বিনুর মার গলা পেল। তার পরই দরজা খুলে গেল। অবাক হল বোধন।

"তোমার কথাই ভাবছিলাম," অনুপমা বললেন, "আসছো দেখলাম। একটা ট্যাকসি ডেকে দিতে পার?"

"ট্যাকসি?"

"বিনুকে নিয়ে ওর কাকা বিবেকানন্দ রোড যাবে। ডাক্তারের কাছে। দেরি হয়ে গিয়েছে।"

"বিনুর কি আবার জ্বর এসেছে?"

"না, যাবার কথা ছিল।"

বোধন কিছু বুঝল না। আবার ফিরে চলল ট্যাকসি ডাকতে। আজ দিন ভাল। বৃষ্টি মেঘ কোথাও কিছু নেই। সন্ধে হয়ে গিয়েছে। মোড়ে ট্যাকসি পাওয়া কঠিন হবে না। কলকাতার দিকে ফিরতি যেতে হলেই ট্যাকসি যেতে চায়।

কিন্তু বিনুর কী হয়েছে? জ্বর যদি না হয়, কী হতে পারে! ডাক্তার দেখাতে বিবেকানন্দ রোডই বা কেন? এখানেই তিন চারজন ডাক্তার রয়েছে। সাহা মন্দ ডাক্তার নয়। হয়ত বিবেকানন্দ রোডের ডাক্তার বিনুদের পরিচিত, পুরোনো। কিন্তু বিনুরা তো আগে বিবেকানন্দ রোডে থাকত না। প্রাচী সিনেমার দিকে থাকত।

বোধন হাঁটতে হাঁটতে মোড়ের দিকে চলল। যাবার সময় মহুয়াকে দেখতে পেল। একা একা একপাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে. মুখ ভরতি দাড়ি,

রোগা, গায়ের জামা ঢলঢল করছে, এলোমেলো প্যান্ট। মনুয়াকে এই রকমই দেখা যায়, মুখ নীচু করে হেঁট মাথায় হাঁটছে একা একা। কাছে গিয়ে ডাকলে তাকাবে। চোখ ফাঁকা, বাঁ চোখের পাতা মণি ঢেকে ফেলেছে, নাক বেঁকা, মনুয়া তাকাবে, চিনতে পারবে হয়ত, কিন্তু চিনলেও কথা বলবে না। বড় জোর ঠোঁটে পাতলা, বিষণ্ণ একটু হাসি ফুটবে।

মনুয়া আজকাল নেশা করে। রোজ। বোধন শুনেছে, গাঁজা খায়। এ-পাড়ায় ড্রাগসও চলে। চলতি নাম হল আচার। অনেকেই খায়, মদও মারে।

যারা খায় খাক, বোধন তাদের জন্যে ভাবে না। কিন্তু মনুয়াকে এই অবস্থায় দেখলে তার বড় কষ্ট হয়। মনুয়া যে বোধনের বন্ধু ছিল তা নয়, চেনাজানা ছিল। মনুয়া ডাক্তারী পড়ত। সেকেণ্ড ইয়ার। ঝকঝকে ছেলে ছিল। ক্রিকেটে নেশা ছিল। বল করত বেশ। সেই মনুয়া রাতারাতি পাল্টে যেতে যেতে একেবারেই অন্য রকম হয়ে গেল। তাকে আর পাড়ায় দেখা যেত না। মনুয়া বাড়ি ছেড়ে দিল। তারপর একদিন শোনা গেল, মনুয়াকে ব্যারাকপুরে পুলিস ধরেছে। বছর আড়াই পরে মনুয়া বাড়ি ফিরল, একেবারে অন্যরকম, বাঁ চোখ প্রায় নষ্ট, নাকের হাড় ভাঙ্গা, ডান হাতের বুড়ো আঙুল থেঁতলানো। রোগা কাঠি হয়ে গিয়েছে মনুয়া, পা টেনে টেনে হাঁটে। বাড়ি ফিরে মনুয়া দেখল, বাবা মারা গিয়েছে, মা আগেই গিয়েছিল, বাড়ির অভিভাবক দাদা। মনুয়া বাড়িতে ফিরল, কিন্তু স্নেহ, মমতা, আন্তরিকতা পেল না। বাবা নেই; দাদা কোনো টান দেখাল না। বরং মনুয়া আসায় বিরক্ত, বিব্রত, অসন্তুষ্ট হল। দাদা ভাল চাকরি-বাকরি করছে, বাহারী বউ, ছোট ভাইকে পরিবারের পক্ষে স্বস্তিদায়ক মনে করতে পারল না। নিজেদের সুখস্বস্তি শান্তির পক্ষে মনুয়া যেন

কেমন বিঘ্নের মতন। বাড়িটা বাবার, মানে বাবা করেছিল, কাজেই মন্নুয়াকে তাড়াতে পারে না, সে-অধিকার তার নেই বলেই বাধ্য হয়ে ঠাঁই দিতে হয়েছে ভাইকে—নয়ত দিত কিনা কে জানে! বোধন এ-সব কথা নিজে জানে না, স্নকুমারদার কাছে শুনেছে।

মন্নুয়া এখন কিছু করে না। বাড়িতেই থাকে। সকালের দিকে কদাচিৎ তাকে বাইরে দেখা যায়। সে বাজারে আসে না, আড্ডা মারে না, বন্ধুদের সঙ্গে বসে না, রাস্তায় ঘোরাফেরা করতেও দেখা যায় না। সন্ধের দিকে কিন্তু মন্নুয়াকে চোখে পড়ে, একা একা আপন মনে, মুখ নীচু করে, নেশায় কেমন আচ্ছন্ন হয়ে রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। যেন মাঝ রাস্তাটা সে অন্যদের জন্যে ছেড়ে দিয়েছে, যাও ভোমরা—যাও, আমি তফাতেই থাকলাম।

বোধন মোড়ে আসতে না আসতেই ট্যাকসি পেয়ে গেল। ধরল ট্যাকসিটাকে।

ফেরার সময় দেখল মন্নুয়া ঠিক আগের মতনই হেঁটে যাচ্ছে।

বিনুরা তৈরী হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল।

ট্যাকসি আসতেই বিনুর কাকা গিরীন ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এলেন। ঘড়ি দেখলেন। "নাও, বিনু নাও, তাড়াতাড়ি উঠে পড়। অ্যাপয়েণ্ট-মেণ্ট মিস করব।" বলে ড্রাইভারকে বললেন, "ভাই, একটু তাড়া-তাড়ি। আমার ডাক্তার না চলে যায়। বিবেকানন্দ সেণ্ট্রাল অ্যাভিন্যু ক্রসিং।"

বিনু এসে ট্যাকসিতে উঠল। পরনে শাড়ি। উঠতে উঠতে বলল "কাল নিশ্চয় আসবে।"

গিরীন উঠে পড়লেন।

ট্যাকসি চলে গেল।

বোধন দুমুহূর্ত ট্যাকসি দেখল, তার পর মুখ ফিরিয়ে বিনুর মাকে।

বিনুর মা পাছে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে যান বোধন কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই অনুপমা বললেন, "এসো, ভেতরে এসো।"

বোধন অবাক হল। বিনুর মা এমন করে ডাকবেন সে আশা করে নি। টাকার কথা বলবে বলে বোধন আজ এসেছে। উনি দরজা বন্ধ করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলে বোধনকে সদরে দাঁড়িয়েই টাকার কথা বলতে হত। যাক, ভালই হল!

বোধন ভেতরে এল। দরজা বন্ধ করলেন অনুপমা।

বসার ঘরে আলো জ্বলছিল। "তোমার কোনো তাড়া নেই তো! একটু তা হলে বসো। চা খেয়ে যাও।" বলেই আবার অন্যমনস্ক হয়ে নিজের মনে কথা বলার মতন করে বললেন, "কোথায় যে চাবিটা ফেললাম! খুঁজে আলমারিটা বন্ধ করে আসছি।"

অনুপমা চলে গেলেন।

বোধন বিনুর মাকে ঠিক এতখানি সহজ হতে আগে বিশেষ দেখে নি। মহিলা অবশ্য কোনোদিনই অভদ্রভাবে কিছু বলেন নি বা করেন নি, তবু আজ তার ব্যবহার আরও নরম, সহজ মনে হচ্ছিল। কেন, কে জানে!

সোফায় বসে বোধন ঘরের চারদিক দেখতে লাগল। নতুন করে দেখার কিছু নেই। চেনা ঘর। সাধারণ সোফা সেট, বাড়তি চেয়ার, জানলা ঘেঁষে রাখা অর্ধেক গোল টেবিল, বুক কেস, ক্যালেণ্ডার, ছবি বড়সড় রেডিও সেট প্লাস্টিকের ফুল—মোটামুটি এই। বোধন এমন কিছু এখানে দেখে না যা নতুন—যা দেখলে তাকে অবাক হতে হবে। বোধন এ-সমস্তই দেখেছে, তাদের বাড়িতেও এক সময় এ-সবই ছিল, উনিশ বিশ তফাত থাকতে পারে, তবে ছিল, আজ নেই।

বিনুদের বাড়ির আসবাবপত্র দেখে বোধনের কোনোদিনই মনে হয় না, ওরা তেমন পয়সাঅলা লোক। সচ্ছল নিম্নমধ্যবিত্ত যেমন

হয় তেমন। এই বাড়িও কোনো প্রাসাদ নয়। তবে নতুন বাড়ি, খানিকটা তকতকে হয়ে আছে, বেশ খানিকটা ফাঁকাও। ভাড়াও শ চারেক। আজকাল বাড়ি ভাড়া এই রকমই। বরং বিনুরা চার ঘরঅলা, খাবার জায়গা রান্নাঘর, বাথরুম সমেত বাড়িটা কমেই পেয়ে গিয়েছে। আরও একশো বেশী হতে পারত।

ভেতরে শব্দটব্দ হচ্ছিল। বিনুর মা হাঁটাচলা জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করছেন। কাশলেন। বোধন বসে থাকল। আজ সে টাকাটা বিনুর মার কাছে চাইবে। লজ্জা করবে না। টাকাটা দরকার বোধনের। মা আজ অফিস যায় নি। পায়ের ব্যথা বেড়েছে। দাঁড়াতেও কষ্ট হচ্ছে মার। বোধন যদি পারে আজ একবার সাহা ডাক্তারের কাছে যাবে, কাল সকালেই মাকে দেখিয়ে নেবে। প্যাণ্টটা আনার কি হবে কে জানে! যদি মার জন্যে কুড়ির মধ্যে খরচ হয়—বোধন প্যাণ্ট নিয়ে নেবে। নয়ত পারবে না।

"আমার যে কি হয়েছে কে জানে!" বিনুর মার গলা পেয়ে বোধন তাকাল।

অনুপমা বসার ঘরের চারদিকে তাকালেন, "আলমারি খুললাম। রিপোর্ট বার করে দিলাম, টাকা দিলাম—তারপর চাবিটা যে কোথায় রাখলাম—আর পাচ্ছি না।"

বোধন অকারণে ঘরের চারদিকে তাকাল, যেন চাবিটা খুঁজছে।

অনুপমা রেডিয়োর আশপাশ, টেবিল, ফুলদানি, সোফা দেখলেন। "আছে কোথাও, পাব ঠিকই।"

"মেঝেতে পড়ে যায় নি তো?"

"মেঝেতে? না, মেঝেও তো দেখলাম।" অনুপমা যেন মনে মনে আরও একবার ঘরের মেঝে দেখে নিলেন। "যাকগে, পরে খুঁজব। আচ্ছা তোমায় একটা কথা বলি, আমাদের বাড়ির পেছন দিকে ওই

যে একটা টিনের চালা আছে, লোহা-লক্কড় পড়ে থাকে, মাঝে মাঝে একটা ভাঙ্গাচোরা টেম্পো এসে দাঁড়ায়—ওটা কিসের ঘর?” কথা বলতে বলতে চশমা খুলে রেখে দিলেন অনুপমা।

বোধন বুঝতে পারল। বাড়ির পেছনে মানে অন্তত চল্লিশ পঞ্চাশ গজ দূরে টিনের চালাটা। বলল, “পুরোনো লোহা স্টক করে, আবার বেচে দেয়।”

“দু তিনজনকে দেখেছি, আমাদের এদিকে ঘোরাঘুরি করে। তাদের মধ্যে একটাকে দেখলে ভয় হয়। গুণ্ডা বদমাশের মতন দেখতে।” বলে অনুপমা একটু থেমে আবার বললেন, “বিন্নুর কাকা বলছিল, ওখানে নেশাভাঙ্গ চলে।”

বোধন অবাক হল না। চলতেই পারে নেশাভাঙ্গ। কোথায় চলে না!

“তুমি একটু থেকে যাও। কোনো কাজ নেই তো? আমার শরীরটাও আজ ভাল নেই। দাঁড়াও তোমার চা নিয়ে আসি।” অনুপমা চলে গেলেন।

বোধন বুঝতে পারল, বিন্নুর মা তাকে আটকে রাখতে চাইছেন, যতক্ষণ পারা যায়। মহিলা একটু ভয় পেয়েছেন বোধ হয়। ভয়ের যে একেবারেই কিছু নেই তা নয়, তবে এই সন্ধেবেলায় দরজা ভেঙ্গে চুরি ডাকাতি হবে যে তারও কোনো কারণ নেই। গায়ের পাশে বাড়ি না থাকলেও কাছাকাছি বাড়ি আছে। লোকজন চলছে রাস্তায়। দুর্গা মিষ্টান্ন, মধুসূদন ভাণ্ডার খোলা। বোধনের অবশ্য বসতে আপত্তি নেই। বসে থাকলে কথায় কথায় টাকার ব্যাপারটা সহজে তুলতে পারবে! বিন্নুর কথাই আবার মনে পড়ল। বিন্নুকে তো ভালই দেখাল আজ কালকের তুলনায়। তবে ডাক্তারের কাছে কেন গেল?

অনুপমা চা নিয়ে ফিরে এলেন। চায়ের সঙ্গে প্যাসট্রি। বললেন,

"খাও, বিনুর কাকা এনেছে। ভাল জায়গা থেকে।"

আবার চলে গেলেন। ফিরেও এলেন সামান্য পরে। নিজের জন্যে চা এনেছেন। বসলেন মুখোমুখি।

"আমাকে একজন সারাদিনের লোক যোগাড় করে দাও না। বড় অসুবিধে হয়। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত থাকবে।" অনুপমা বললেন।

"আমাদের বাড়িতে যে কাজ করে তাকে বলব।"

"বলো। আমি কম টাকা দেব না।...টাকায় আটকাবে না। তবে একশো দুশো চাইলে অন্য কথা।"

টাকার কথাটা উঠে পড়ায় বোধন ইতস্তত করে বলল, "একটা ব্যাপারে আমার কিছু টাকার দরকার পড়েছে।"

অবাক হতে যাচ্ছিলেন অনুপমা, সঙ্গে সঙ্গে কিছু মনে পড়ে গেল বোধ হয়।

"তোমাকে তো টাকাই দিই নি এ মাসে। তাই না! ছিছি, মনেই পড়ে নি। তুমিও কিছু বলো নি। কী লজ্জার কথা বলো তো! তা তুমি একবার মনে করিয়ে দিলে পারতে। আজকাল পাঁচ ঝামেলায় আমার সব কথা মনে থাকে না। অনবরত ভুল হয়। মেয়েই আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছে।"

"কী হয়েছে বিনুর?" বোধন জিজ্ঞেস করল।

"কী জানি! কমাস মাত্র আগে টানা ভুগে উঠল। তখন বুকের এক্সরে হল দু দফা, রক্ত থুতু কত কি পরীক্ষা করানো হল। কিছু পায় নি। এম গাঙ্গুলী—খুব বড় ডাক্তার, তিনি দেখেছিলেন। তাঁর কাছেই আবার পাঠালাম, বুক ব্যথা বুক ব্যথা বলছে।"

বোধন চা খেতে লাগল। বিনু বড় রোগা। টিবি হয়ে যাবে নাকি? সঙ্গে সঙ্গে বোধন এই খারাপ চিন্তাটাকে সরিয়ে দিল।

া, না ; তা কেন হবে। বুকে ব্যথা বোধনেরও হয়েছিল। কার না
য়। ঠাণ্ডা লেগেছে।

চা খেতে খেতেই, অনুপমা বললেন, "তোমার টাকাটা এনে
দিই।"

"যাবার সময় নেব।"

"তা নেবে। আগে দেখি বাইরে অত টাকা রেখেছি নাকি?
বন্নুর কাকাকে টাকা বের করে দিলাম আলমারি থেকে। রাখতেও
পারি। না রাখলে চাবি খুঁজতে হবে।"

একেই বলে কপাল। বোধন টাকা পাবে, চাবি খুঁজে পাওয়া
যাচ্ছে না এখন। বিন্নুর মা চাবি না পাওয়া পর্যন্ত বোধনকে বসে
থাকতে হবে। আর যদি বরাত ভাল হয় বোধনের বিন্নুর মা টাকা
এমনিতেই পেয়ে যাবেন।

ধীরে সুস্থে অলসভাবে চা খাচ্ছিলেন বিন্নুর মা। বোধন তাঁকে
দেখছিল বার বার। আজও তাঁর পরনে কালকের সেই কালো পাড়
শাড়ি, জমি ধবধব করছে। গায়ে মিহি সাদা জামা। আজকের জামার
হাত ছোট। গলায় হার। হাতে দুগাছা করে সরু চুড়ি। সাজগোজ
যেমন থাকে তেমনই তবে মুখ একটু শুকনো দেখাচ্ছিল। মেয়ের
চিন্তায় বোধ হয়। তবু বোধনের ভাল লাগছিল। আজ বিন্নুর মাকে
বেশী ভাল লাগছে। উনি কখনো এত বেশি কথা বলেন না, এতটা
ও ব্যবহারও করেন না। আজ করছেন। বোধ হয়, বোধনকে
বসিয়ে রাখতে চান বলে। খানিকটা ভয় আছে ওঁর। আবার মেয়ের
জন্যে উদ্বেগ। একা থাকলে উদ্বেগ আরও বাড়ে।

বিন্নুর মাকে এতটা ভাল, সহজ হতে দেখে বোধন একবার
কুমারদার কথা ভাবল। বলবে নাকি ওকে কথাটা? বিন্নুর কাকা
বোধনকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না?

সঙ্কোচ কাটিয়ে বোধন বলল, “আপনাকে একটা কথা বলব বল
ভাবি।” বোধন লজ্জা পাচ্ছিল।

অনুপমা বোধনের মুখ দেখছিলেন। “কী কথা ?”

বোধন আবার ইতস্তত করল। “সুকুমারদা বলছিল, কাকার য
হাত তাতে একটা যেমন-তেমন চাকরি আমার করিয়ে দিতে পারেন।”

অনুপমা সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিলেন না। ভাবলেন
“বলবো”।

বোধন খুশী হল। বোধ হয় প্রশ্রয়ও পেল। বলল, “আমার বাব
একরকম ইনভ্যালিড। অথর্ব। মা চাকরি করেন। আমার একটা
কিছু হলে ভাল হয়। বেকার হয়ে বসে আছি।”

অনুপমা সামান্য মাথা নাড়লেন। শুনেছেন তিনি। জানেন।

“তুমি বসো, আসছি।” অনুপমার চা খাওয়া শেষ হয়েছে।
উঠলেন, হাতে চায়ের কাপ। বোধনের কাপ প্লেটও তুলে নিলেন।
নিয়ে চলে গেলেন।

আজ দিন ভাল যাচ্ছে বোধনের। বিন্নুর মাকে মনে করিয়ে দিতে
টাকা পেয়ে যাচ্ছে। চাকরির কথাটাও বলতে পারল মুখ ফুটে। বিন্নু
মা বললে কাকা কি চেষ্টা করবেন না ?

মোটর বাইকের শব্দ আসছিল। শব্দটা যেমন হয়—বাড়তে বাড়তে
বাড়ি কাঁপিয়ে কিছুটা দূরে চলে গেল। এ নিশ্চয় সেই কালোয়া
টাইপের লোকটা, যে টিনের শেড বানিয়ে স্ক্র্যাপ আয়রনের কারবা
করছে। লোকটা আগে সাইকেল চেপে আসত, এখন পুরোনো মোট
বাইক কিনেছে বোধ হয়। ওদেরই হয়। ছেঁড়া কাগজ, ভাঙ্গা কাচ
ফুটো গামলা থেকেও এরা টাকা করে নেয়। বোধনরা পারে না
বিন্নুর মা কি এই লোকটাকে দেখে ভয় পান ? কেন ? বেটা কি এখানে
কোনো বেয়াদপগিরি করছে ? চোখ রাখতে হবে তো ! সুকুমারদা

বলবে বোধন।

আর ঠিক এই সময় ঝপ করে অন্ধকার হয়ে গেল। এই ছিল, এই নেই। পলকের মধ্যে সব ঘুটঘুটে অন্ধকার। আলো চলে গেল। তার মানে সাত সাড়ে সাত হল। মোটামুটি এই সময় যায় এ-পাড়ায়, আসতে আসতে নটা তো বাজবেই। দেরিও হতে পারে।

অন্ধকারে বসে থাকল বোধন।

বিনুর মা এবার লণ্ঠন জ্বালবেন। কিংবা মোমবাতি।

বোধন অপেক্ষা করতে লাগল। ভেতর থেকে কোনো সাড়া শব্দ আসছে না। আলো নিবলে 'এই যাঃ' কিংবা 'গেল এবার' এ-রকম একটা আঁতকে ওঠার শব্দও শোনা যায় বোধন তেমন কোনো শব্দ শুনতে পেল না। দরজার দিকে তাকাল বোধন, কোনো আলোও জ্বলছে না ভেতরে। বিনুর মা কি লণ্ঠন খুঁজছেন? মোমবাতি পাচ্ছেন না? কিন্তু কোনো শব্দ নেই কেন? হাঁটাচলার শব্দ, পায়ের শব্দ, হাতড়ানোর শব্দ—কোনো কিছুই শোনা যাচ্ছে না; একফোঁটা আলোও আসছে না ভেতর থেকে। আশ্চর্য।

বোধন অপেক্ষা করতে লাগল। কান পেতে রাখল।

অদ্ভুত তো! বিনুর মা কি বাড়িতে নেই। বাড়ি ছেড়ে যাবেনই বা কোথায়? কেনই বা যাবেন?

প্রথমে গলার শব্দ করল বোধন, আশা করল ভেতর থেকে সাড়া আসবে। এল না।

রীতিমত অবাক হয়ে বোধন এবার ডাকল, "মাসীমা?"

কোনো সাড়া নেই।

"মাসীমা?" বোধন আরও জোরে ডাকল।

এবারও কোনো জবাব এল না।

হঠাৎ কেমন ভয় পেয়ে গেল বোধন। কী হল বিনুর মার।

বোধনের পকেটে দেশলাইও নেই। এখন সে কী করবে? উঠে পড়ল বোধন। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ঘরের বাইরে এল। সদর বন্ধই মনে হচ্ছে। পাশের ঘরের দরজা খোলা বোধ হয়, ওটা বিনুর ঘর। তারপর মাঝখানে একটু প্যাসেজ, প্যাসেজের গায়ে পাশাপাশি দু ঘরে বিনুর মা আর কাকা থাকেন। বোধন এ-বাড়িতে নতুন নয় বলে ঘরগুলো চেনে। শোওয়া, বসা, রান্না— এই তো ঘর। বিনুর মা কোথায়? কোন ঘরে? 'মাসীমা', বোধন ডাকল, দু পা সাবধানে এগিয়ে আবার 'মাসীমা?'···অদ্ভুত বাড়ির মধ্যে কোথাও কোন শব্দ নেই, আলো নেই। মানুষটা কি হারিয়ে গেল? বোধনকে ভয় দেখাচ্ছেন? মজা করছেন? বিনুর মা মজা করার মানুষ নন। কেনই বা করবেন! বোধন ভয়ে, উৎকণ্ঠায় দিশেহারার মতন হয়ে পড়ছিল। একটু আলো থাকলেই কী হয়েছে দেখা যেত। কিন্তু আলো কই? বোধন কেন যে একটা দেশলাই রাখে না পকেটে!

আন্দাজে, হাতড়ে হাতড়ে বোধন রান্নাঘরের দিকে চলল। বাঁ দিকে রান্নাঘর। বোধন দেখেছে। দেশলাই রান্নাঘরেই থাকবে আলো না জ্বালা পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারছে না।

বোধ হয় পথে একটা মোড়া ছিল; পায়ে লেগে উলটে গেল একটা পাপোশ-গোছের কিছু, প্লাস্টিকের বালতি বা ঝুড়িতে পা আটকাল। কিছু একটা হয়েছে বিনুর মার! নয়ত এতক্ষণ কেন তিনি সাড়া দেবেন না, আলো জ্বালবেন না!

রান্নাঘর খুঁজে পাবার পর বোধন দেশলাই খুঁজতে গিয়ে বাসন-পত্র ফেলে দিল, কাপ প্লেট ভাঙল, চিনির কৌটো হোক বা অন্য কিছু উলটে ফেলল। শেষে হাতড়ে হাতড়ে দেশলাই পেল। এতক্ষণে

খানিকটা ভরসা পেল বোধন।

দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে লণ্ঠন খুঁজল। পেল না। বাইরে আসতেই দেরাজের মাথায় লণ্ঠন দেখল। পরপর দুটো লণ্ঠন। ছোট মোমদানে একটা মোমবাতি।

বোধন মোমবাতি জ্বালিয়ে নিল। সদরের দরজা বন্ধ। বিনুর মার ঘরের দরজাও খোলা। বিনুর ঘরে ঢুকল বোধন, কেউ নেই।

বেরিয়ে এসে বিনুর মার ঘরে ঢুকতেই বোধনের হাত থেকে মোমবাতি পড়ে যাচ্ছিল। বিছানার পাশে মেঝেতে আড়াআড়ি হয়ে পড়ে আছেন বিনুর মা। বোধনের বুক ধক্ করে লাফিয়ে উঠল, ভয়ে পা কাঁপছিল, কাঠ হয়ে গেল সর্বাঙ্গ। কী সর্বনাশ! বিনুর মা কি মারা গেলেন?

বোধনের হাত পা ঠাণ্ডা, অসাড়। বুকে নিঃশ্বাস আটকে কেমন যেন দমবন্ধ হয়ে আসছিল। অসহায়, ভীত, বিভ্রান্ত অবস্থা বোধনের। মোমবাতি হাতে নিয়ে ঝুঁকে পড়ল বোধন। দেখল। না, মারা যান নি।

এবার বোধন মোমবাতি পাশে রেখে বসল। বিনুর মার শরীর কেমন বেঁকে আছে, পায়ের পাতাও বাঁকা, হাত মুঠো করা, চোখ বন্ধ, দাঁতে দাঁত লেগে রয়েছে। ঠোঁটের তলায় ফেনা। থুতু উঠছিল। শুকিয়ে যাচ্ছে। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন বিনুর মা। মৃগী বোধ হয়, ফিটের ব্যারাম। বোধন তার পিসীকে ফিট্ হতে দেখেছে।

যাক, মানুষটা বেঁচে আছে। কী ভয় যে পাইয়ে দিয়েছিলেন বিনুর মা।

আলো রেখে দিয়েই বোধন উঠল। জল এনে চোখেমুখে ঝাপটা দিলেই হুঁশ ফিরে আসবে। ধোঁয়া নাকে লাগালেও আসে। পিসীর বেলায় তারা ব্লটিং পেপার পুড়িয়ে নাকের কাছে ধরত। ধোঁয়া

লাগলেই পিসী নড়েচড়ে উঠত।

বাইরে এসে বোধন দেরাজের মাথার ওপর রাখা লণ্ঠনটা এবার জ্বেলে নিল। আলোয় অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল রান্নাঘর।

জল নিয়ে বোধন আবার ঘরে এল। লণ্ঠনও এনেছে। বিনুর মা এখন আর বেঁকে বা কুঁকড়ে যাচ্ছেন না। শরীরটা আগেই ধনুকের মতন যা বেঁকে গিয়েছিল খানিকটা। চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিল বোধন। কপালে জল দিল। কপালে, মুখে, গলায়। জোরে জোরে ঝাপটা দিতে লাগল। হাতের মুঠো ভীষণ শক্ত। বোধন জানে দাঁতে দাঁত লাগা খুলতে হলে জোরে গাল টিপতে হবে, না হয় চামচ এনে মুখ হাঁ করাতে হবে। হাতের মুঠোও জোর করে খুলে আঙুলগুলো টেনে দিলে ঠিক হয়ে যাবে। পায়ের পাতা ম্যাসেজ করলে ওই শক্ত বাঁকানো ভাবটাও চলে যায়। কিন্তু বোধন বিনুর মাকে এ-সব কিছু করতে পারে না। সে চোখেমুখে জল দিয়ে খানিকটা বাতাস করতে পারে।

বোধন সে-রকমই করছিল। কাগজ খুঁজে এনে বাতাস করছিল ঝাপটা মেরে মাঝেমাঝে জল দিচ্ছিল চোখেমুখে। থেমে থেমে ডাকছিল, মাসীমা—মাসীমা।

বিনুর মা শেষ পর্যন্ত চোখের পাতা খুললেন। সামান্য। আবার বুজলেন। খানিক পরে তাকালেন দু মুহূর্তের জন্য। চোখ ফাঁকা কিছুই হুঁশ করতে পারছেন না। শুধু যন্ত্রণার ভাব ফুটলো।

"মাসীমা ?"

কোনো সাড়া নেই।

"মাসীমা— ! কী হয়েছিল ?"

বিনুর মা চোখের পাতা খুললেন না। বাঁ হাতটা টেনে গলা বুকের কাছে আনলেন। কাপড় সরিয়ে দেবার ইশারা করলেন যেন।

বোধন আড়ষ্ট হয়ে গেল। বিনুরা কেন এখনও আসছে,না? চোখ
ায়ে নিল বোধন। এদিক-ওদিক তাকাল। মেঝেতে দশ টাকার
াট ছড়িয়ে আছে, আলনার পায়ার কাছে চাবির গোছা। বোধন
াতে পারল, ওটাই আলমারির চাবি। তার ধারণা হল, বিনুর মা
র এসে বোধনের জন্যে পঞ্চাশটা টাকা খুঁজে নিয়ে চলে যাবার
য় হঠাৎ ফিট হয়ে পড়েন। আর তখনই আলো চলে যায়।
ন কোনো সাড়াশব্দ করতে পারেন নি। শুধু কোনোরকমে মেঝেয়
ায় পড়েছিল।

এই ভাবে চাবি হারানো উচিত নয়। কিংবা বিনুর মার মতন
গী রোগীর বাড়িতে একা থাকাও অনুচিত। ধরো যদি অন্য কেউ
ত, যেমন গোপেন কিংবা তুলু—তা হলে আজ কী হত বিনুর মার?
ালমারি সাফ হয়ে যেত। টাকাপয়সা, সোনা-দানা সব। বোধনও
চ্ছে করলে নিয়ে নিতে পারে যা খুশি। বিনুর মার কোনো হুঁশ নেই
খনও।

বিনুর মা গলায় কেমন কষ্টের শব্দ করলেন। তাকাল বোধন।

গলা আটকে গিয়েছে। বোধ হয় জল খেতে চাইছেন।

বোধন উঠল। ওঠার সময়েই ভেবে নিল, একটা চামচও আনবে।

গ্লাসে জল এনে বোধন দেখল, বিনুর মা হাতের মুঠো আলগা
রতে পেরেছেন। তাকিয়ে আছেন। দৃষ্টি ঘোলাটে।

"মাসীমা, জল?"

দাঁতে দাঁত লেগে আছে তখনও। চোখের ইশারায় কিছু বোঝাতে
ইলেন। বোধন বুঝল না। চামচে করে মুখে ঠোঁটে জল দিল।
ষে চামচটা দাঁতে ফাঁকে গলাবার চেষ্টা করল, পারল না।

কিছুক্ষণ পরে বিনুর মার দাঁত খুলল। জল খেলেন চামচে
রে।

বুকের কাপড় খুলে ফেললেন অনুপমা। যেন সহ্য করতে পারছে
না। মেঝেতে পুঁটলির মত পড়ে থাকল আঁচল। গলগল কর
ঘামছেন। মিহি জামাটা ঘামে ভিজে গিয়েছে। কিছু জলও পড়েছে
গালমুখ গড়িয়ে জামায়। শ্বাস নিচ্ছিলেন ধীরে ধীরে। কষ্ট হচ্ছে
কোথাও। বুকে। জামার ওপরটা খুলে ফেললেন। নিজেই। নীচে
জামার খানিকটা, বুকের ওপর দেখা যাচ্ছিল।

অনুপমার মুখ ফ্যাকাশে, ঠোঁট মাঝেমাঝে কেঁপে উঠছিল। নীলা
দেখাচ্ছে যেন।

বোধন যে কী করবে বুঝতে পারছিল না। অনুপমার দিকে
তাকিয়ে থাকতে তার লজ্জা করছিল, অস্বস্তি হচ্ছিল।

হঠাৎ চোখে পড়ল বোধনের বিনুর মার বোজা চোখ দিয়ে জল
গড়িয়ে পড়ছে। গাল নাক সামান্য কুঁচকে উঠেছিল, ঠোঁট কাঁপছিল
—তারপর আর কিছু কাঁপল না, শুধু জল গড়াতে লাগল।

বোধন তার পিসীকেও কাঁদতে দেখেছে। তবে পিসী ফি
ছেড়ে যাবার পর হুঁশ ফিরে পেয়ে কাঁদত। বিনুর মার জ্ঞা
এখনও পুরোপুরি ফিরেছে বলে তার মনে হচ্ছিল না। এখন
ঘামছেন।

ঘামে জামা জবজবে হয়ে গেল।

বোধন বাতাস করতে লাগল কাগজ দিয়ে।

আরও একটু পরে বিনুর মা চোখ খুললেন। তাকালেন। যে
হুঁশ করতে লাগলেন। মাথা ফেরালেন। দেখলেন। ধীরে ধী
নিঃশ্বাস নিলেন।

এবার সব খেয়াল হল অনুপমার। বোধনকে দেখলেন। "ওর
ফিরেছে?"

"না।"

“লোডশেডিং?”

“হ্যাঁ।”

অনুপমার উঠে বসতে কষ্ট হচ্ছিল। পারছিলেন না। তবু উঠে বসলেন সামান্য। দেখলেন যেন নিজেকে। তারপর খুব মৃদু ক্লান্ত গলায় বললেন, “তুমি ও-ঘরে গিয়ে বসো।” বলতে বলতে মাটি থেকে আঁচল উঠিয়ে বুকের কাছটা আড়াল করলেন।

ছয়

কলকাতার কাছাকাছি কত কি থাকে! বোধন দু চারবার যে টেঙরায়, গরচা রোডে, গড়িয়ায় যায় নি তা নয় তবে জায়গাগুলো তার কাছে তেমন চেনা নয়। আজ বোধন গিয়েছিল বেহালার দিকে। বঁড়শেট ডাশে পেরিয়ে। একটা কেমিক্যাল কারখানায় লোক নেবে বলে কাগজে বেরিয়েছিল কবে তাও বোধন জানে না। দুম করে একটা চিঠি পেল বোধন। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ থেকে। বোধন কাউকে কিছু বলে নি, সকালে মা অফিস বেরোবার আগেই বেরিয়ে পড়েছিল। গিয়ে পেঁছিতেই ঘণ্টা দুইয়ের কাছাকাছি। তবে যাওয়াই সার। কারখানা নতুন। বছর দুয়েকের। নামেই কেমিকাল, আসলে ব্লিচিং পাউডার, মেঝে পরিষ্কারের লিকুইড্ সোপ, গুঁড়ো সাবান, লেখার সস্তা কালি, কারবলিক অ্যাসিড—এই সব তৈরী করে। বোধনকে দাঁড়াতে হয়েছিল ঘণ্টা দেড়েক। তারপর যা হয়, একবার ডাকল, মুখ দেখল, দু চারটে ফালতু কথা; শেষে 'পরে জানিয়ে দেব।'

বোধন কাছাকাছি একটা দোকান খুঁজে কিছু খেতে ঢুকল। টিনের চালার দোকান। হাতে-গড়া রুটি, আলুর দম, পাউরুটি, ডিমের ওমলেট, চা পাওয়া যায়। হাতে-গড়া রুটি আলুর দম খেয়ে বোধন নাক চোখ মুছতে লাগল। কী ঝাল রে, বাবা। বাসী সোনপাপড়ি ছিল, তাই একটা মুখে দিয়ে সামলাল নিজেকে। চা খেল। তারপর বড়লোকী মেজাজে পাশের দোকান থেকে পান মুখে দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

এখানে-ওখানে নানান গাছ, মাঝেমাঝে জঙলা ঝোপ। গাছের য়ায় পাথরের ওপর বসে বোধন কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিচ্ছিল। গারেট শেষ করে উঠবে। বাস ধরতে মিনিট আট দশ হাঁটতে হবে কে। বোধন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। এসব জায়গা এখনও পুরো র হয় নি। আধা শহর হয়েছে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। কুর, ভাঙা মন্দির, বেলগাছ, নিমগাছ আরও কতরকম কি চোখে ড়ে। রোদও চড়া নয়, তাত নরম, আকাশ নীল। একটু হাওয়া চ্ছিল। আরাম লাগছিল বোধনের। অলসভাবে সিগারেটটা শেষ রতে লাগল।

সাইকেলে কে একজন আসছিল। খাটো ধুতি, গায়ে জামা, ামরের কাছে গামছা বাঁধা। লোকটা যেতে যেতে বোধনকে খল। চলেই যাচ্ছিল। থামল হঠাৎ। নেমে পড়ল। ফিরে এল াধনের কাছে।

দেখল বোধনকে। "নিতাই নাকি?"

বোধন অবাক। লোকটাকে দেখছিল। মাথা নাড়ল।

"নাম কী?"

নাম বলল বোধন।

"এখানে আসা হয়েছিল কেন?'

চাকরির কথা বলল বোধন।

লোকটা বলল, "নিতাই, নিতাই মনে লাগল। জামাইয়ের ছোট াই। থানা থেকে শালাকে হুলিয়া করেছে। ভাবলাম হারামজাদা ফরারী হয়ে বসে আছে এখানে। চলি!"

লোকটা আবার সাইকেলে চেপে চলে গেল। বোধন অনেকক্ষণ লাকটাকে দেখল। নির্ঘাত পাগল।

বোধন উঠে পড়ল। বাস ধরতে হবে।

ঝোপঝাড়, গাছপালা, কখনও রোদ কখনও ছায়া দিয়ে আসতে আসতে বাতাসের দমকা গায়ে লাগার পর বোধন হঠাৎ অনুভব করল, কোথায় যেন শীতের গন্ধ লেগেছে। মাথার ওপর আকাশে অনেক উঁচুতে চিল উড়ছে, কাছাকাছি মেঘ নেই, রোদের রঙ অন্য-রকম, কুলগাছের তলায় জোড়া শালিখ, নয়নতারার জঙ্গলে কত ন প্রজাপতি।

বোধনের হঠাৎ মনে পড়ল নভেম্বর মাসের আজ তিরিশ হয়ে গেল। কাল বাদ দিয়ে পরশু বিনুর কাকার ফিরে আসার কথা। অফিসের কাজে বিনুর কাকা বাইরে গিয়েছেন। ফিরে এসে বোধনকে নিজের কলকাতার অফিসে নিয়ে যাবেন। একটা চাকরি হয়ে যেতে পারে! কথাবার্তা বলা আছে।

বাস রাস্তায় পৌঁছে বোধন দাঁড়াল।

জায়গা ছিল। বোধন বসতে পারল।

হাই উঠছিল। জানলা ঘেঁষে বসতে পারলে হয়ত চোখ বুজে ঘু দিত। বোধন বাসের লোকজন কণ্ডাক্টরকে দেখছিল। টিকি করাও হয়ে গেল।

"আরে—এই—এই যে!"

বোধন তাকাল। চেনাচেনা লাগল। তারই বয়সী ছেলে হা তুলে নিজেকে চেনাচ্ছে।

"কী খবর?" বোধন বলল।

"এই তো। তোমার?"

"আমারও সেই রকম। এদিকে কোথায়?"

"একটা কাজে এসেছিলাম।"

"যাক তবু তোমরা কাজে আসো। আমি ভাই অকাজে ঘু

াড়াই। কী করছ?"

"তেমন কিছুই না," বোধন বলল, "এই সামান্য কিছু।" আসলে াসের মধ্যে চেঁচিয়ে 'কিছুই করছি না' বলতে লজ্জা করল বোধনের। া ছাড়া ছেলেটাকে মুখচেনা লাগলেও তার নাম, কিংবা ও যে কে া মনে করতে পারছিল না! "তুমি কী করছ?"

"পোলট্রি, ডেয়ারী, ফিশারি যা পারছি। এদিকে আমাদের এক হাজন থাকে; মানি ম্যাটার্স…। তার কাছে এসেছিলাম। লেগে াছি, ভাই। পেটটা চলে যাচ্ছে। ফ্যামিলি বার্ডেন কম—তাই াকে আছি। নয়ত মরে যেতাম। তোমার আর সব খবর ভাল?"

"চলেছে। আজকাল আর কে ভাল থাকে!"

একটু থেমে ছেলেটি আবার বলল, "জয়ন্তর খবর শুনেছ?"

জয়ন্তর নাম মনে পড়ল বোধনের। কলেজে একই সঙ্গে পড়ত। াই ছেলেটিও তা হলে কলেজের একজন হবে।

"জয়ন্ত কানাডা চলে গিয়েছে। লেগে থেকে থেকে বাগিয়ে ফেলল াক। ওর এক দিদিও আছে কানাডায়। জয়ন্ত লাকি, ভাই। তুমি া-রকম একটা চেষ্টা করলে পারতে। নাইজেরিয়া সোমালিল্যাণ্ড কাথাও হয়ে যেত। আমি একটা লাগিয়ে রেখেছি। যদি চান্স পাই কেটে পড়ব। দূর, এখানে, ঘোড়ার ঘাস কেটে কী লাভ!"

বাসের মধ্যে এত কথাবার্তা ভাল লাগছিল না বোধনের। সবাই শুনছে। নিজেদের ব্যাপার দশজনের সামনে চেঁচিয়ে বলার কী আছে! বোধন জানলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

আরও তিন চার স্টপ এগিয়ে ছেলেটি নেমে গেল। "চলি। এখানে একটা কাজ সেরে ফিরব।"

পরের স্টপে বোধন জানলার দিকে জায়গা পেল। কোথায় এল াস সে জানে না। তবে এখনও ট্রাম দেখা যাচ্ছে না।

ছেলেটিকে আবার মনে পড়ল বোধনের। কলেজে নিশ্চ
পড়ত তাদের সঙ্গে। নাম যে কী বোধনের মনে এল না। হয়
ছেলেটিও নাম ভুলে গেছে বোধনের। এই রকমই হয়। বোধন তা
ছেলেবেলার সব বন্ধুর কথা মনে রাখতে পারে নি, মানিকতলা
অনেকের কথা তার একবারও মনে পড়ে না। দু-চার জনের কথ
নিশ্চয় পড়ে। যেমন হারীত। হারীতের বাড়িতে এখনও দু-এক মা
অন্তর যায় সে। বড় ভাল ছেলে। হারীত বায়ো-কেমেস্ট্রি নিয়ে রিসা
করছে। দু বছরের স্কলারশিপ পেয়েছে হারীত।

এই হারীত সেদিন একটা অদ্ভুত কথা বলেছিল। সে নাকি
বোধনের দিদিকে একদিন এসপ্লানেডে দেখেছে। সঙ্গে একটা বাচ্চা
ছেলে। ট্রাম ধরার জন্যে দাঁড়িয়েছিল।

অন্য কেউ বললে বোধন বিশ্বাস করত না। হারীত বলেছিল
বলেই সে বিশ্বাস করেছিল। একটু সন্দেহ তখনও ছিল, আজও
আছে। কথাটা বাড়িতে কাউকে বলে নি বোধন। বলে লাভ কি
দিদিকে সবাই ভুলে গিয়েছে: মা, বাবা, চুয়া। দিদির কথা কেউ
বলে না। মা কখনো নয়। বাবার মুখ থেকে কথাই শোনা যায় না,
তো কি বলবে! আর চুয়া? সে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। বাড়িতে যতক্ষণ
থাকে মার মুখের ভয়ে এটা-ওটা নাড়াচাড়া করে, নয়ত সে নিজের
মতন। বাড়ির ওপর তার বিরক্তি, ঘেন্না বোঝা যায়। চোখের ওপর
দেখতে দেখতে কেমন পালটে গেল। রোজই বাড়ির বাইরে যায়।
কোথায় ঘোরে কে জানে—, বলে গানের টিউসনি করে, থিয়েটারে
রিহার্সাল দেয়। মা তেমন কিছু বলে না, এক-আধ দিন গালাগালি
দেয় অবশ্য, কিন্তু অত বড় মেয়েকে মা আর কি বলবে! যাকে কিছুই
দিতে পারে না মা—একটা ভাল শাড়ি না, জামা না, জুতো না—; না
পারে মেয়েকে আলাদা করে এক শিশি স্যাম্পু কিনে দিতে। তাকে মা

কোন লজ্জায় বলবে, "না, তুমি বাড়িতে বসে থাকো।' চুয়া যা করছে তাতে তার হাতে কিছু অন্তত আসে। তাতে চুয়ার নিজের দরকার সামান্য মেটে। আর দায়ে-অদায়ে মা নিজেও তো দু চার টাকা চায়।

হারীত বলছিল, দিদি গোলগাল হয়েছে। ছেলেটাও দেখতে ভাল। বিভিনাথের রঙ ছিল কুচকুচে কালো। কিন্তু চোখা চেহারা ছিল। দিদির ছেলের চেহারা ভাল হতেই পারে। তবে বেটা নিশ্চয় কালো হবে। বোধনের হাসি পেল, আবার কষ্টও হল। দিদিকে একবার কি সে দেখতে পায় না? কত সময় কত পুরোনো লোকের সঙ্গে আচমকা দেখা হয়ে যায়, যেমন আজই হল। দিদির সঙ্গে বোধনের যদি এইরকম দেখা হয়ে যেত!

আচ্ছা, দিদিই বা এমন নিষ্ঠুর কেন? সে কেন মা বাবাকে চিঠি লেখে না? কেন আসে না একবার? এলে কি মা তাকে তাড়িয়ে দেবে? দিদি কোনো খোঁজই করে না নিজের মা-বাবা-ভাই-বোনের। দিদি মা বাবার খোঁজ করতে পারত। পুরোনো কথা এতকাল কেউ মনে করে রাখবে না। মার অফিসের কথা দিদি জানে, দিদি অন্তত মার অফিসের ঠিকানায় চিঠি দিয়ে খবর নিতে পারত। সে নেয় না। হয়ত ভুলে যেতে চায়, ভুলেই গিয়েছে।

মেয়েরা মাকে কি তেমন ভালবাসতে পারে না? বিনুর বেলাতেও তাই দেখছে বোধন। আগে অত বুঝতে পারত না। এখন বুঝতে পারছে, বিনু তার মার ওপর তলায় তলায় খুশী নয়। মুখে সে হুট করে কিছু বলে না, কিন্তু ভেতরে বোঝা যায়।

ক'দিন আগে বিনু তাকে মুশকিলে ফেলেছিল। কী কথায় ফট করে বলল, "মা তোমাকে ডিউটি দেয় নি?"

"ডিউটি কিসের?"

“কাকা থাকবে না, কানপুর যাচ্ছে। মাকে ক’দিন গার্ড দিতে বলে নি ?

বোধন থতমত খেয়ে গেল। “তার মানে ?”

“বাঃ, মা এখন তোমার ওপর দারুণ খুশী। সেদিন যা উপকার করেছ মার। তুমি না থাকলে ফিট হয়ে মরে পড়ে থাকত !”

কথাটা ঠিক না; আবার একেবারে মিথ্যেও নয়। যদি এমন হত, বিনুর মা মোমবাতি ধরিয়ে আসতে গিয়ে পড়ে যেতেন তবে কাপড়-চোপড়ে নির্ঘাত আগুন লেগে যেত। বাড়িতেও তো তখন কারুর থাকার কথা ছিল না।

“ফিটে কেউ মরে না। তবে কাপড়-চোপড়ে আগুন লেগে গেলে বিপদ হত। ওই জন্যে বলে, ফিটের রুগীর ভয় জলে আর আগুনে।”

ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করল বিনু। তারপর বলল, “তা বাবা, এখন তুমি মার বেশ পেটোয়া হয়েছ। তোমার ওপর কত—কি বলব —দাঁড়াও, হ্যাঁ কনফিডেন্স।”

বোধন হাসল।

“হাসছ ?” বিনু যেন বিরক্ত।

“হাসব না তো কি করব! আমার ওপর কারও কোনো কনফিডেন্স নেই।”

বিনু আড়চোখে দেখল বোধনকে। তারপর খাতার ওপর ডট পেন দিয়ে কিছু লিখল, হাত আড়াল করেই। বোধন দেখল না। পড়া থামিয়ে গল্প করছিল বিনু, আবার কিছু লিখে নিচ্ছে ভেবে বোধন মনে মনে সেদিনের কথাটা ভাবতে লাগল। বিনুর মা মেঝেতে পড়ে আছেন, পায়ের দিকের কাপড় অগোছালো, হাত মুঠো, পায়ের পাতা বাঁকা, দাঁতে দাঁত লেগে রয়েছে—এই দৃশ্যটা সে

ভুলতে পারে না। আবার ওরই সঙ্গে সে ভুলতে পারে না, বিন্নুর মার বুকে কাপড় নেই কোথাও, আধ-খোলা জামা ঘামে-জলে ভিজে নীচের জামা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গলার তলার দিকের বুক দেখা যাচ্ছে। বোধন সেদিন থেকে কতবার যে এই দৃশ্যটা মনে মনে দেখেছে। কেন ? বিন্নুর মা বয়েস হলেও সুন্দর বলে ?

“মা তোমায় না সেদিন বলছিল ভাল শালকরের কাছে দুটো শাল দিয়ে আসতে ?” বিনু বলল।

“হ্যাঁ। দিয়ে দিয়েছি তো ?”

“বড় কাঁচিটাও ধার করিয়ে এনে দিয়েছ !”

তাও দিয়েছে বোধন। কিন্তু এসব কথা আসছে কেন ? এটা ঠিক, বিন্নুর মা আগে যেমন বোধনকে কুনজরে দেখতেন না তেমন খুব সুনজরেও নয়। নিস্পৃহ ভাব ছিল। এখন সেটা নেই। বিন্নুর মা তাকে আজকাল স্নেহই করছেন। দু একটা সাংসারিক কাজকর্মের কথা বলেন। বোধন করে দেয়।

বিনু হঠাৎ বলল, “মার এই ফিটের ব্যারামটা কবে থেকে, জান ?”

“বলেছ তো, পুরোনো।”

“পুরোনো মানে কত পুরোনো জান না তো ?”

“না, কেমন করে জানব।”

বিনু কিছু ভাবল। “পরে একদিন বলব।”

কথা পাল্টাবার জন্যে বোধন বলল, “মাসীমাকে বলেছি, কাকাবাবুকে বলে আমায় একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে।”

“জানি।”

“তোমার কি মনে হয় ? কাকাবাবু চেষ্টা করলে নিশ্চয় হবে !”

বিনু ঘাড় হেলাল। "হবে বই কি!"

বোধন খুশী হল। "তুমি একটু তাগাদা মেরো না, প্লিজ!"

বিনু হাসল না। লেখার ওপর থেকে হাত সরাল। তারপ
কাগজটা এগিয়ে দিল বোধনের দিকে।

বোধন দেখল, বিনু জড়িয়ে জড়িয়ে লিখেছে: আই ডু নট লাইক
মাই মাদার।

সাত

জগৎ অনেকক্ষণ থেকে উসখুস করছিল। দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যেতে চায়। আবার একবার তাগাদা দিল বোধনকে।

বোধন বলল, "কী করবি বাড়ি গিয়ে?" এমনিই বলল, কিছু না ভেবেই।

"ঘুমিয়ে লেব। আজ আমার লাইট গার্ডের ডিউটি আছে।" জগৎ এই রকমই। 'ন' তার মুখে কমই আসে, সবই 'ল'। সুকুমারদা মাঝেমাঝে জগতকে খেপায়ঃ 'এই জগা, ধর তুই বিয়ে করলি—তোর বউয়ের নাম হল নিভারানী। তখন তুই কি করবি?' জগৎ বলবে না; সুকুমারদাও ছাড়বে না। শেষে সুকুমারদা জগতকে মাস্টারের মতন 'ন'-এর উচ্চারণ শেখাবেঃ 'নবাব নন্দন, নিত্য নব নর্তকী নাচাইয়া আছ খাশা!·· বল শালা।' তারপর যতরকম হাসি মসকরা।

বোধন বলল, "নে তবে—দোকান বন্ধ কর।" বোধনেরও শরীর ভাল লাগছিল না। মাথা ধরে আছে, গা ম্যাজমেজ করছে। ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছে। দেখতে দেখতে শীতও আসছে।

জগৎ দোকান বন্ধ করতে লাগল।

সুকুমারদা দিন দুই হল কলকাতায় নেই। বর্ধমানে গিয়েছে। বর্ধমান শহর থেকে খানিকটা তফাতে সুকুমারদাদের বাড়ি। পাকা বাড়ি। তার কতটুকু বাসযোগ্য আছে কে জানে। সুকুমারদার মা আর কিছুতেই ছেলে-বউয়ের কাছে থাকবে না। বউ বজ্জাত, বউ

সহবত জানে না, বউ শুধু সাজন-গোজন আর সিনেমা শিখেছে।

রোজ বাড়িতে অশান্তি, খিচির-মিচির, মা বলে—তুই আমার বেটা হয়ে থাক। বউ বলে—তুমি আমার স্বামী না, তবে? ধুর শালা, সুকুমার অত ঝঞ্ঝাটে নেই। বেশ, চলো তুমি বর্ধমানে জ্ঞাতিগোষ্ঠী তো আছে, তা ছাড়া না না করেও দু-চার বিঘে জমি। চলো তোমায় বর্ধমানেই রেখে আসি, অতই যখন তোমার ইচ্ছে।

বর্ধমানের বাড়িতে মায়ের থাকার ব্যবস্থা সেরে সুকুমারদা ফিরবে। বোধনকে দোকান দেখাশোনা করতে বলে গিয়েছে। কাল পরশু নাগাদ ফিরে আসবে সুকুমারদা।

জগৎ দোকান বন্ধ করে চাবি দিল বোধনকে। বোধন চাবি আর খুচরো বিক্রীর বাইশ তেইশটা টাকা সুকুমারদার বউয়ের হাতে তুলে দিয়ে বাড়ি চলে যাবে। কাল দোকান খোলার সময় জগৎ গিয়ে চাবি আনবে।

জগৎ চলে গেল। বোধনও আর দাঁড়াল না। নাক গলা জ্বলে যাচ্ছে। মাথা ভার। কপাল যেন ছিঁড়ে পড়ছে। দুটো বড়ি না খেলেই আর নয়। সকালে চারটে কিনেছিল, দুটো খেয়েছে।

রোজই যেমন হয় আজও সেইরকম হল। অন্ধকার হয়ে গেল ঝপ করে। মধ্যে ক'দিন এই সময়টায় আলো থাকছিল, যাচ্ছিল রাত্রের দিকে—দশটার পর। আবার পুরোনো খেলা শুরু করেছে।

সুকুমারের বাড়ি দূর নয়। মিনিট আট দশের রাস্তা। অন্ধকার দিয়ে গলি দিয়ে হাঁটছিল বোধন।

যেতে যেতে একটা হাসি-হুল্লোড় শুনল। তাকাল বোধন। দুধের ডিপো আর বটোর কয়লার দোকানের পাশে একফালি জমির ওপর যে বাড়ি তৈরী হচ্ছে সেখানে জনাচারেক ছেলে বসে। দিশী মদের গন্ধ আসছে যেন। বোধন বুঝতে পারল, কচার দল।

কচা সকালে পাড়ার রিকশাঅলাদের ইউনিয়ন করে, সেলফ্ মেড নেতা। ভোটে মস্তানি করার পর থেকে কচার স্ট্যাটাস হয়েছে। রিকশা-নেতা কচা তার রেট বেঁধে দিয়েছে: রিকশা প্রতি রোজ পঁচিশ পয়সা। রিকশা ইউনিয়ন করে কবে কচার লোভ বেড়ে গিয়ে সে বাজারের সব্জি এবং মাছঅলাদের দিকে হাত বাড়াতে গিয়েছিল—সেখানে জোর ধাক্কা খেল, গোপাল আরও বড় কর্মী, কচাকে বেদম মারল। তুটো পটকা ফাটিয়ে কচা আবার যেমন কে তেমন।

এক সময় বোধন এদের ভয় করত। এখন করে না। কারণ, এরা পাড়ার লোকের প্রত্যেকের গা শুঁকে জেনে নিয়েছে, কার কত দূর দৌড়? বোধনের পেছনে সুকুমারদা আছে, কাজেই সে নিশ্চিন্ত।

কচারা বোধনকে দেখতে পেল কি-না কে জানে, কিছু বলাবলি করল নিজেদের মধ্যে নীচু গলায়—তারপর শেয়ালের ডাকের মতন তিন চারটে গলা 'কেয়া হুয়া' গাইতে লাগল।

বোধন তাকাল না। কচারা বোধনেরই সমবয়েসী। পাড়ার ছেলে। তবু বোধন কোনোদিনই ওদের সঙ্গে মেলামেশা করে নি। ভাল লাগে না। বোধনরা যখন মানিকতলা থেকে এখানে প্রথম এল—তখন কচা স্কুলের পড়া ছেড়ে দিয়ে বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে চায়ের দোকানে বসে বসে রকবাজি করে। তার সাকরেদ ছিল বস্তির কটা গুণ্ডা। বোধনকে নতুন পেয়ে কচা পেছনে লেগেছিল। খিস্তি করত। পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়াও বাধাল একদিন, ঘুঁষোঘুষি খামচাখামচি হল দুজনে, তারপর মনুয়া কোথ থেকে উড়ে এসে দু-চারটে লাথি কষাতেই সব শান্ত। বোধন তখন থেকেই ওই লাফার লোচ্চাটাকে ঘেন্না করে।

এরাও কিন্তু বেশ আছে। রিকশাঅলার কাছ থেকে পয়সা নেয়,

দোকান থেকে এটা ওটা ঝাড়ে, ছিনতাই করে তেঁতুলতলার দিকে, একটা ঝামেলা বাধিয়ে দিতে পারলেই ছু পয়সা। পুলিস কত বার ধরে নিয়ে গিয়েছে, আবার ছেড়েও দিয়েছে।

বোধন সুকুমারের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতেই গায়ের ওপর রিকশা এসে পড়ল।

কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না বোধন। বউদি বসে।

"আমি তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম।" বোধন বলল—"কোথায় যাচ্ছ ?"

"চাবি এনেছ। দাও।" বোধন দোকানের চাবি আর টাকা দিল। "যাচ্ছ কোথায় ?"

"শ্যামাদের বাড়ি। আমার নেমন্তন্ন আছে।"

"ফিরবে কখন ?"

"ক-ত আর! ন'টা।"

"আচ্ছা যাও।"

রিকশা চলে গেল। বউদি যে কী মেখেছিল কে জানে, সস্তা ভারী গন্ধ ছড়িয়ে গেল বাতাসে।

বাড়ি ফিরে বোধন দেখল, মা ফেরে নি। চুয়াও বাড়ি নেই। বাবা দরজা খুলে দিল।

দরজা খুলে বাবা আবার নিজের জায়গায় চলে যাচ্ছিল।

"মা ফেরে নি ?"

"না।"

এতক্ষণে ফিরে আসার কথা মার। প্রায় আটটা বাজতে চলল "ফিরতে দেরি হবে বলে গেছে ?"

"আমায় কিছু বলে যায় নি।" শিবশংকর বললেন।

"চুয়া ?"

"বেরিয়েছে।" শিবশংকর নীচু হয়ে মাটিতে কি যেন দেখছিলেন।

বোধন ঘরে ঢুকে অন্ধকারে প্যাণ্ট ছাড়ল। লুঙ্গি পরে বাথরুমে চলে গেল। ফিরে আসার সময় আবার বাবাকে দেখল। টেবিলের সামনে বাবা বসে আছে। ছোট ময়লা লণ্ঠন জ্বলছে সামনে। জানলা খোলা। বাবার সামনে আধ-ছড়ানো তাস। মাটির ভাঁড়। বিড়ি আর দেশলাই। যখন বাবার হাতে ক্রস ওয়ার্ড থাকে না বা ওইরকম কিছু—তখন বাবা তাস নিয়ে বসে পেশেন্স খেলে। মা দু চক্ষে তাস খেলা দেখতে পারে না। মা না থাকলে বাবা লুকিয়ে তাস খেলে।

বোধনের হঠাৎ মনে হল, বাবা বসে বসে পেশেন্স খেলছিল, তারপর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে প্রথমে ভেবেছিল মা, মা ভেবে ভয় পেয়ে তাস গুটোতে গিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে ফেলেছে কয়েকটা। অথচ পরেই বাবা বুঝতে পেরেছিল মা নয়। সিঁড়িতে মার পায়ের শব্দ হলে বাবা বুঝতে পারে, আর কড়া নাড়ার শব্দ বুঝবে না! আসলে ভুল হয়ে গিয়েছিল বাবার।

বাবার এই ছেলেমানুষিতে বোধনের হাসি পেল, মায়াও হল। মেঝেতে পড়ে থাকা বাকী কটা তাস তুলে দিতে দিতে বলল, "মার এত দেরি হচ্ছে কেন ?"

"আটকে পড়েছে কোথাও। কলকাতার যা হালচাল।"

"হয়ত মিছিল বেরিয়েছে।...তুমি বিকেলে চা খেয়েছ ?"

"জবা করে দিয়েছিল।"

"কেন, চুয়া ?"

"চুয়া বিকেলের আগেই চলে গিয়েছে।"

চুয়ার আজ নিশ্চয় কোনো থিয়েটার আছে। অফিস ক্লাবে। এই পাড়ারই কে একজন সেদিন বলছিল, তাদের অফিসের থিয়েটারে

চুয়াকে পার্ট করতে দেখেছে। "আরে, বোধন তোমার বোন কি অ্যামেচার প্লে করে! স্টেজে দেখে তাই মনে হচ্ছিল। তবে রঙচঙ মেখে ড্রেস পরে নেমেছিল তো! চিনতে পারছিলাম না। প্রোগ্রামে আবার নাম লেখা অর্চনা।...তা ভালই করেছে। স্টেজ ফ্রি।'

চুয়ার ভাল নাম অর্চনা।

বোধন হঠাৎ বলল, "চা খাবে?"

"চা? তুই করবি?"

"করি। আমার জ্বরজ্বর লাগছে। এ-পি-সি খেয়ে গরম চা খাব আলোটা একবার নিচ্ছি।" বোধন রান্নাঘরে ঢোকার আগে লণ্ঠনটা তুলে নিল। কুপি জ্বালিয়ে নিয়ে আবার এসে রেখে দিল টেবিলে। রান্নাঘরে চলে গেল।

কেরোসিন স্টোভে চায়ের জল চড়িয়ে দিয়ে বোধন বাইরে আসতেই কড়া নড়ে উঠল। মা এসেছে। মা জোরে জোরে কড়া নাড়ে। থামে না। বেশ বোঝা যায় মা অধৈর্য।

বোধন বাবার দিকে তাকাল। শিবশংকর তাস লুকিয়ে ফেললেন।

দরজা খুলে দিল বোধন।

সুমতির পায়ে যেন জোর নেই, দম ফুরিয়ে গিয়েছে; কোনো রকমে চটিটা ছেড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে এগিয়ে এসে টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে পড়লেন। ছেঁড়াখোঁড়া ময়লা চামড়ার ব্যাগটা ফেলে দিলেন টেবিলের ওপর। পায়ের কাপড় হাঁটু পর্যন্ত তুলে নিলেন। ক্লান্ত, রুক্ষ, অবসন্ন চেহারা। ঘাম জমেছে মুখে। হাঁ করে শ্বাস টানছিলেন।

বোধন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, তোমার এত দেরি? জিজ্ঞেস করল না। মা আগে দম নিয়ে সামলে নিক।

সুমতি জল চাইলেন মেয়েকে ডেকে।

"চুয়া নেই।" বলে শিবশংকর বোধনের দিকে তাকালেন। বোধন জল আনছিল।

"কোথায় গিয়েছে ও?" সুমতি স্বামীর দিকে তাকালেন।

"আজ বোধ হয় হাতিবাগান।"

"বোধ হয় কি! ঠিক করে বলতে পার না! সব কথায় বোধ হয়।"

শিবশংকর চুপ করে থাকলেন। যে-মানুষটা এইমাত্র বাড়ি ঢুকল তাকে চটাতে চান না।

বোধন জল এনে দিল।

সুমতি ছেলেকে দেখলেন। আগে খেয়াল হয় নি হয়ত, এখন হল। জল খেয়ে হাঁফ ফেললেন। "তুমি আজ বাড়িতে যে?"

বোধন জবাব দিল না। এ সময় বাড়িতে থাকাটা যেন তার মস্ত অপরাধ হয়ে গিয়েছে।

সুমতি আঁচলে মুখ মুছে একটু হাওয়া খেতে লাগলেন। বোধন রান্নাঘরে চলে গেল।

শিবশংকর নীচু গলায় বললেন, "আজ বাসের গণ্ডগোল ছিল?"

"কোন দিন না থাকে! ছ্যাঁচড়ামির শেষ নেই। যেমন স্টেট তেমনি প্রাইভেট।"

"এই জায়গাটাও দূর···!"

সুমতি কান করলেন না। "রান্নাঘরে ও কি করছে?"

"চা। ওর জ্বর জ্বর লাগছে। চা দিয়ে ওষুধ খাবে।"

সুমতি বড় করে শব্দ করে শ্বাস ফেললেন। "আজ ঘটকবাবু এসেছিলেন দোকানে।"

শিবশংকর গলা পরিষ্কারের শব্দ করলেন। "ঘটক? কেন?"

"মেয়ের বিয়ে। কটা ভাল শাড়ি কিনতে এসেছিলেন। আঠাশে

অঘ্রান বিয়ে।”

“কেমন আছে সব ?”

“ভাল। আরও গোলগাল দেখতে হয়েছেন। মাথার চুল পেকেছে। শরীর ভাঙে নি।”

“ঘটক আমার চেয়ে দু বছরের ছোট ছিল

“তোমার কথা বাদ দাও। তুমি ছোট থাকলেই বা কি হত, আর বড় হয়েই বা কি হয়েছে! দেখলাম তো, কেমন সুখেশান্তিতে আছে। মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে। সবাই মিলে ব্যাংক থেকে জমি কিনেছে তারাতলায়। বাড়ির কাজ বলল অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। এখনও চার পাঁচ বছর চাকরি বাকী।” সুমতির গলা কেমন ক্ষোভে দুঃখে কাতর হতাশ শোনাচ্ছিল।

বোধন চা করতে করতে মা-বাবার কথা শুনছিল। স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছিল সব।

শিবশংকর প্রথমটায় জবাব দিলেন না; পরে চাপা গলায় যেন বললেন, “তা ভগবান আমার···।”

“ভগবান ভগবান করো না—” সুমতি ধমকে উঠলেন; রুক্ষ গলায় বললেন, “ভগবান তোমায় কোলে বসিয়ে দুধ-ভাত খাওয়াবে! যেমন কর্ম করেছ তার ফল ভোগ করছ! ভগবানকে ঝেঁটা মেরে লাভ কি!”

শিবশংকর মুখ নীচু করে নিলেন। মাটির ভাঁড়ে ছাই দেখছিলেন।

একটু চুপ করে থেকে সুমতি বললেন, “ভদ্রলোকের মতন তো থাকো নি, থাকলে অদৃষ্টে এমন হত না। ঘটকবাবুর মতন তুমিও চাকরি করতে পারতে। আরও দু এক বছর থাকত রিটায়ার করার। ব্যাংকের চাকরি এখন রাজার চাকরি। কত রকম সুবিধে। বাড়ি আমার হতে পারত। ···নাও, যেমন কর্ম করেছ এখন তার ফল ভোগো।”

শিবশংকর মুখ ফসকে বললেন, "পুরনো কথা সকলেই ভুলে যায়।"

"মানে?" সুমতি খেপে উঠলেন। "ভুলে যায় মানে কি! তুমি বলতে চাইছ, বিয়ের পর আমায় কত সুখে রেখেছিলে—এই তো? মুখে রাজভোগ তুলে দিয়েছ, না? লজ্জা করে না তোমার বলতে। বিয়ের পর রেখেছিলে তো এক দশ ঘরের বাড়িতে। দেড়খানা ঘরে বন্দী থেকে ঝিয়ের মতন সারাদিন তোমাদের সংসারে গতর দিয়ে খেটেছি আর ছেলেপুলে নিয়ে নেটা-ঝামটা খেয়েছি।"

শিবশংকর কথা থামাবার জন্যে বিব্রত হয়ে উঠলেন। "না না, আমি তা বলি নি।"

"বলো নি আবার কি! গোড়াটা ভুলে যাও। বলার সময় কবে গোঁফে আতর মেখেছিলে সে-গন্ধ আমায় শোকাতে এসেছ! কে তোমায় আতর মাখতে বলেছিল! যেমন ছিলে তেমন থাকলেই পারতে। আমি কি তোমায় মানিকতলার বাড়ি ভাড়া করতে পায়ে ধরেছিলাম! তুমি তোমার মা বোনের জন্যে করেছিলে, আমার জন্যে নয়। তখন ভেবেছিলে পয়সা কামাচ্ছ, আর কি! খাও দাও, বগল বাজাও···। চাল চালিয়াতির কমতি তো করো নি। সে তুমি করেছ, তোমার মায়ের ঘটা করে শ্রাদ্ধ করেছ, বোনের চোখের জল মুছিয়েছ! আমার কী করছ? দুটো গয়না গড়িয়ে দিয়েছিলে! সে গয়নাও তোমাদের জন্যে বেচে তোমাদের পেটে দিয়েছি।"

শিবশংকর আর কথা বললেন না।

বোধন চা নিয়ে এল। রাখলো টেবিলে। বাবা অধোবদন হয়ে বসে আছে। লজ্জা, কুণ্ঠা নতুন করে আর বাবাকে আড়ষ্ট করে না। বাবা এমনিতেই আড়ষ্ট। প্রত্যহ দুবেলা বাবা এই দীনতা সহ্য করে নির্বিকার, সহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। বাবার অধোবদন মূর্তিটা এখন নাটকের দৃশ্যের মতন মনে হয়, যেন এই ভঙ্গিটুকু এই মুহূর্তের মানান-

সই ভঙ্গি। বোধন দুঃখের চেয়ে যেন বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হল। বাবা কেন নিজেকে বাঁচাতে পারে না! কেন এত নির্বিকার, সহিষ্ণু! অচেতন!

"তোমায় চা দেব?" বোধন বলল মাকে।

"না।"

"চা রেখেছি।"

"কাপড় না ছেড়ে খাব না!"

বোধন মুখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যেই বোধ হয় সুমতি আপাতত থেমে গেলেন। তাঁর সমস্ত মুখে বিরক্তি, রাগ, উত্তেজনা।

সুমতি উঠে পড়লেন। ভেতরে ভেতরে রাগে ফুঁসছেন।

ঘরে গিয়ে সুমতি ডাকলেন, "আলো দাও। একটা মোমবাতি ছিল অর্ধেক। র‍্যাকের ওপর ছিল। জ্বালিয়ে দিয়ে যাও।"

বোধন র‍্যাক খুঁজল; পেল না। এদিক-ওদিক দেখল।

শিবশংকর খুব নীচু গলায় বললেন, "এটা দিয়ে এসো। ছোট টেবিল-বাতিটা ঘরে আছে—নিয়ে এসো জ্বালিয়ে নেব।"

বোধন লণ্ঠন তুলে নিয়ে মার ঘরে গেল।

সুমতি অন্ধকারে শাড়িটা ছেড়ে ফেলেছেন। পরনে নোঙরা, ময়লা সায়া। গায়ের জামাও খুলে ফেলে নীচের জামাটা খুলছিলেন। বিশাল জামা। নোঙরা, চিট। দুর্গন্ধ ভেসে আসছিল মার শরীর থেকে, ময়লা আর ঘামের। বোধন মাকে দেখল। কী মোটা, বীভৎস চেহারা মার।

ছোট টেবিল-বাতিটা খুঁজে নিয়ে লণ্ঠন রেখে চলে আসছিল বোধন। শুনল, মা আপন মনে ঝাঁঝালো গলায় বলছে, "এত মানুষ রোজ যায়, আমি কোন পোড়া কপাল নিয়ে বেঁচে আছি! আমি কেন যাই না!...একদিন যাব, তারপর দেখব—তোমরা কেমন

চোখের জলে নাকের জলে হও।"

কথাটা শুধু বাবাকে নয়, তাদের সকলকে শুনিয়ে বলা।

বোধন বাতি এনে টেবিলের ওপর রাখল। ছোট টেবিল-বাতি। শিবশংকর দেশলাই জ্বেলে দিলেন। বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে বোধন রান্নাঘরে গেল। তার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে! গরম গরম খাবে ভেবেছিল। মার চা ঢাকা দিয়ে রাখল। বড়ি দুটো ঘরে। শার্টের পকেটে। খেয়ে নিতে হবে। বাড়িতে ঢুকলে মাথা আরও ধরে যায়।

রান্নাঘর থেকে চা নিয়ে বেরিয়ে আসছিল বোধন—মা একটা ময়লা শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাথরুমে যাচ্ছে। যেতে গিয়ে থামল, বাবার দিকে তাকাল। তারপর বোধনের দিকে।

"আমার ব্যাগে মুড়ির ঠোঙা আছে। দাও তোমার বাবাকে।"

সুমতি বাথরুমে চলে গেলেন লণ্ঠন হাতে করে।

বোধন টেবিলের ওপর চা রেখে মার ব্যাগ খুলল। সস্তা ফোম লেদারের ব্যাগ। অনেক পুরোনো। ময়লা হয়ে গিয়েছে, মুখের কাছটায় ছেঁড়া, কাঁধে ঝোলাবার স্ট্র্যাপটার একদিকে সেফটিপিন দেওয়া।

ব্যাগ খুলল বোধন। এক ঠোঙা মুড়ি।

মা মাঝে মাঝেই অফিস থেকে ফেরার সময় ওই পাড়া থেকে ঝালমুড়ি, ভুট্টা, বাদামভাজা, কাঁচা পেয়ারা টুকটাক নিয়ে আসে। ঝালমুড়িটা প্রায়ই। ওটাই সন্ধের জলখাবার। অন্য কোনো জলখাবার থাকে না।

বোধন ঝালমুড়ির ঠোঙাটা বাবার সামনে রাখল।

শিবশংকর মাথা নাড়লেন। খাবেন না।

বোধন বুঝতে পারল। ভাবল একটু। ঠোঙা খুলে নিজে এক মুঠো নিয়ে মুখে দিল।

"ভাল করেছে।" বোধন বলল।

শিবশংকর কিছু বললেন না।

বাথরুমে মা জল ঢালছে। গা ধুচ্ছে। গা ধুয়ে সামান্য জিরোবে তারপর রাত্রের সামান্য কিছু রান্না।

"লোকটা মাকে খুব খাতির করে ঝালমুড়ি করে দেয়," বোধন আর এক মুঠো নিল। সে চাইছিল, বাবা দু মুঠো খাক। যদি না খায় মা আবার যে কী করবে কে জানে!

শিবশংকর কিছুই বললেন না। তাঁর বসা বিষণ্ণ চোখ যেন ছলছল করছিল।

বোধন খুব মৃদু গলায় বলল, "মা চটে যাবে। একটু খাও।"

শিবশংকর মাথা নাড়লেন। তিনি খাবেন না।

আট

বিনু এক হাতে অনেকগুলো চুড়ি পরেছিল। তার রোগা লিকলিকে হাতে চুড়িগুলো ঢলঢল করছে। হাত নাড়লেই শব্দ হচ্ছিল। ইচ্ছে করেই শব্দ করছিল বিনু।

বোধন বলল, "এত চুড়ি পরেছ কেন?" ঠাট্টা করেই বলল।

"ইচ্ছে হল।"

"তোমার?"

বিনু ভুরু বেঁকাল যতটা পারে "আমার কত সোনা আছে, জান?"

বোধন হেসে ফেলল। "না। কত?"

"পঁচিশ ভরি।···এ-সব আমার বাবার দেওয়া।"

বোধন এবার খানিকটা অবাক হল। বলল, "তোমার হাতে অত বড় দেখাচ্ছে।"

"মার হাতের মাপে তখন হয়েছিল। করিয়ে রেখেছিল বাবা। হয়ে আমি পরব।"

"আচ্ছা!"

বিনু তার মেয়েলী গরম ভেস্টটা আলগা করল। "কাল পরশু পড়ল। আজ আবার কমে গেল। আমার গরম গরম লাগছে।"

বোধনের লাগছিল না। বিনুর লাগতে পারে গরম। দু তিন প্রস্থ বোধনের জামার তলায় গেঞ্জিও নেই। ঠাট্টা করে বোধন লল, "সোনার গরম।"

বিনু এবার আড় চোখ করে বোধনকে দেখল! হাসি হাসি ঠোঁট।

বলল, "এ আর কি গরম! পরে দেখবে।"

বোধন মাথা চুলকে নিল। রগড করেই। তারপর বলল, "না

অঙ্কটা করো।"

বিন্নু ডট পেন ফেলে দিয়ে দু হাত ছড়িয়ে আলস্য ভাঙল। "তু

অত মাস্টারী করো না তো! কি হবে অঙ্ক করে! একটা গাড়ি য

জোরে যায়—যাক। আমার বয়েই গেল! ভেলোসিটির নিকু

করেছে!"

"বাঃ, পড়বে না?"

"ধ্যুত, পড়ে ঘোড়ার ডিম হবে।···ভাল লাগে না।"

"কী করবে তবে?" বোধন সরলভাবে বলল, হালকা গলায়।

বিন্নু চোখ বুজে ভাবল যেন, তারপর বলল, "বিয়ে।"

বোধন থমকে গিয়েছিল, পরে হেসে উঠল! জোরে, বেশ জোরে

বিন্নু বলল, "হাসছ কেন! বিয়ে তো আমার ঠিকই করা আছে।

বোধনের হাসি তখনও থামে নি। "কোথায়?"

"দিল্লিতে।···আমরা আগে দিল্লিতে ছিলাম জান তো? বা

মারা যাবার পরও কিছুদিন ছিলাম। তারপর কাকা কানপুরে এল

সেখান থেকে কলকাতায়।"

না-জানার কারণ নেই বোধনের। এ-সব কথা তো উঠেই থা

যখন-তখন। বিন্নু এখনও দু চারটে হিন্দী বুলি মিশিয়ে দেয় বাংলা

সঙ্গে। দিল্লিতে বছর সাত পর্যন্ত ছিল বিন্নু। তারপর কানপুরে

চার বছর। শেষে কলকাতায়। তিন জায়গার জল বিন্নুকে আর য

করুক পড়াশোনায় মতি দেয় নি।

বোধন মজার গলায় বলল, "তোমার কি দিল্লিতেই বিয়ে হচ্ছে?

বিন্দুমাত্র আড়ষ্ট হল না বিন্নু, যেন তার কোনো মেয়ে বন্ধুর স

ব্যক্তিগত কথা বলছে, বলল, "হচ্ছে তো! রাজুর পড়াশোনা সব শে

চাকরিও পেয়ে গিয়েছে। এখনই আয় ন শো। চণ্ডিগড়ে পাঠিয়ে দিলে আরও বাড়বে, কোয়ার্টার পাবে।”

বোধন অবাক হয়ে যাচ্ছিল। বিন্নু বরাবরই সাদামাটা, সরল, সোজাসুজি কথা বলে।—কিন্তু নিজের বিয়ের কথা, যে ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে তার কথা যেভাবে বলছিল এমন করে কোনো মেয়ে বলতে পারে কোনো ছেলের সামনে সে জানত না। বিন্নু কি সত্যি কথা বলছে? মিথ্যেই বা কেন বলবে? বোধনের কেমন কৌতূহল হল। যে-ছেলেটির কথা বলল বিন্নু সে নিশ্চয় বিন্নুর চেনাজানা। কতটা চেনাজানা?

“চেনা ছেলের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে তবে?” বোধন সরল গলা করে বলল।

“বাঃ, আমার ইনু-মাসীর ছেলে তো রাজু। একসঙ্গে খেলেছি, ঘুরে বেড়িয়েছি। রাজু কানপুরে এসেছে দু বার। কলকাতায় একবার। কলকাতা একেবারে লাইক করে না।”

বোধন খানিকটা ঘাবড়ে গেল। মাসীর ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয় কি করে? নিশ্চয় নিজের মাসী নয়। কিংবা হতেও পারে। আজকাল কত কি লোকে মানে না।

বইয়ের পাতা ওল্টাল বোধন অকারণে। হাসল। “আজ কি তাহলে তোমার বিয়ের গল্পই হবে? অঙ্কটা করবে না?”

মাথা নাড়ল বিন্নু। “ভাল লাগছে না!”

“বিয়ের তো দেরি আছে”, বোধন মজা করে বলল।

“না না, কে বলল। জানুয়ারির লাস্টেই হয়ত বিয়ে।” বলে বিন্নু হাতের চুড়ি দেখাল। “এই সব চুড়ি ভেঙে আবার গড়াতে দেওয়া হবে। সেই জন্যেই তো পরেছি। দুদিন বাড়িতে পরে নিই।”

বোধন বই বন্ধ করল। “তা হলে আর আমি বসে থেকে কি

করব ?

"ইস ! উঠবে মানে ! মা ফিরুক ।" বিন্নু ভুরু কোঁচকাল ।

"মাসীমা কোথায় গেলেন ?"

"সামনের বাড়িতে । লম্বুর বউয়ের শরীর খারাপ হয়েছে—ডাকতে এসেছিল লম্বুর মা ।"

"লম্বু ? লম্বুটা কে ?"

"লম্বুকে চেন না ? ও-বাড়ির ছেলে । বাঁশের মতন লম্বা । আমরা লম্বু বলি ।"

বোধন গলা ছেড়ে হো হো করে হেসে উঠল । ফণীদার দারুণ নাম দিয়েছে তো বিন্নু ।

বোধন বলল, "ফণীদা শুনলে তোমায় মারবে ।"

"একেবারেই নয় ! লম্বুদা আমায় কত ভালবাসে । দেখলেই হাসে ।"

বোধন কথা পাল্টাল । "মাসীমা অনেকক্ষণ গিয়েছেন ।"

"আসবে এখুনি । বসো না । যাবে কোথায় ?" বলে বিন্নু কি ভেবে আচমকা জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, তুমি এই সন্ধেবেলাটা ঠিক করে নিলে কেন ? সকালে কি কর ?"

বোধন খানিকটা অবাক হল । বলল, "আমি ঠিক করব কেন ! তোমরাই করেছ ! মাসীমা বললেন, "শীতের দিন, সকালে হুড়োহুড়ি হয়, তোমার কলেজ থাকে··· ।"

বিন্নু বললে, "আর সন্ধেবেলায় লোড শেডিং হয়··· ।"

"হয় তো ! মাঝে মাঝে দু চার দিন ভাল থাকে একটু, আবার হয় । আজ এখনও হয় নি ।"

"টুকলে তো ! এই বার হবে ।"

হতে পারে যে বোধন জানে । লোড শেডিং হলে বিন্নু একটা বড়

টেবিল ল্যাম্প এনে টেবিলে বসিয়ে দেবে। কাকা কিনে এনেছেন চাঁদনি থেকে। বাতিটা দেখতেই বড়। আলো তেমন হয় না। পড়া-শোনার গরজ এমনিতেই বিন্নুর নেই, আলো চলে গেলে একেবারেই থাকে না। তখন শুধু আজেবাজে গল্প। বোধনের নিজের তাতে আক্ষেপের কিছু নেই। সে এত কম বোঝে যে পড়ানোর ব্যাপারটা যত কম হয় ততই তার সুবিধে।

বিন্নু সামান্য চুপচাপ ছিল। এবার বলল, "মা খানিকটা ভীতু গোছের। কাকার ফিরতে দু তিন দিন দেরি হয়। বুধবার শুক্রবার তো হবেই। তোমায় মা এই সময়টায় সন্ধেবেলায় হাতছাড়া করতে চায় না।"

কথাটা বোধনের কানে লাগল। "কেন! তুমি তো বাড়িতেই থাকো!"

"দূর, আমার ওপর কি ডিপেণ্ড করা যায়! মার ওই রকম হলে আমিই ভয় পেয়ে যাই।"

বোধন জানে, এর মধ্যেও বিন্নুর মার আবার একদিন ফিট হয়েছিল। রাত্রে! বিন্নুর কাছে শুনেছে। তারপর আর হয় নি, বলল, "রোগটা সারানো যায় না?"

"কই! সারছে কই! আগে আরও বেশী বেশী হত। যখন তখন। বাবা মারা যাবার পর থেকেই শুরু। কাকা আগে তো আমাদের বাড়িতে ঠিক থাকত না। কাছাকাছি থাকত। বাবা মারা যাবার পর আমাদের সঙ্গে থাকে। কাকাই মার সব দেখাশোনা করত। মা তখন যেখানে সেখানে ফিট হত। খেতে বসে, বাথরুমে, কাজ করতে করতে···! মুখে থুতু উঠত গেঁজার মতন, মুখ নীল হয়ে যেত। কত ওষুধপত্র খেয়েছে। কিছু হয় নি।"

"বড় বাজে রোগ। তোমায় বলেছি না, আমার পিসীর হত।

বিধবা হয়ে এল পিসী তার পর থেকেই। মেয়েদেরই হয় এটা।"

"হ-য়! মার আগে যত হত, এখন আর হয় না। বয়েস বাড়লে নাকি কমে যায়! মা তখন ছিপছিপে ছিল। এখন তো মোটাসোটা হয়ে গিয়েছে। রোগা শরীরেই নাকি বেশী হয়। তখন কিন্তু ফিটের পর এত শরীর খারাপ হত না। আজকাল হয় কম, কিন্তু একবার হলে একদিন দেড়দিন সামলে উঠতে লাগে।"

বোধন কোনো কথা বলল না। বিনুর মার ফিট হয়ে পড়ে থাকার দৃশ্য আবার তার চোখের মধ্যে ভাসতে লাগল। এলোমেলো শাড়ি, বুকে কাপড় নেই, জামা ভিজে, নীচের জামা আঁট হয়ে আছে।

আচমকা বোধনের মনে হল, সে যা মনে মনে দেখছে বিনু যেন তা বুঝতে পেরে তার দিকে তাকিয়ে আছে। বোধন তাড়াতাড়ি বলল, "পিসীকে দেখতাম একাদশী টেকাদশী হলেই এ-রকম বেশী হত। বোধ হয় উইক্‌নেসের জন্যে।"

বিনু মাথা নাড়ল! "মা একাদশী করে না!···মার অন্য ব্যাপারে হয়। বেশী ভাবলে, রাগ হলে, দুশ্চিন্তা করলে। মা বড় অদ্ভুত। কখনো চেঁচামেচি করবে না, ছটফট করবে না, যা হবে সব পুষে রাখবে। তারপরই ওই রকম। সেদিন তো তাই হল। আমার বড় ডাক্তার দেখাবার কথা উঠল। কাকা না-না করছিল; কাজ ছিল কাকার। মা রেগে গেল। কাকা তখন বলল, বেশ—ব্যবস্থা করবে।"

বোধন এই খবরটা জানত না।

বিনু আপন মনে হাত থেকে চুড়ি খুলতে লাগল। এক হাত থেকে খুলে অন্য হাতে পরছিল। নীচু মুখেই বলল, "একটা কথা বলছি—কাউকে বলবে না?"

বোধন অবাক।

"প্রমিস করো।"

"করলাম।"

বিনু অর্ধেক চুড়ি অন্য হাতে পরে নিল। "মা আমার তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিতে চায় এই জন্যেই। রাজু আমায় দেখবে। খুব ভাল রাজু। আমায় কী যে ভালবাসে!"

বোধন বিনুর মুখ দেখছিল। রোগা, কালচে মুখ, টানা টানা চোখ, কিন্তু কী সুন্দর দেখাচ্ছে বিনুকে। সারা মুখে মালিন্য নেই, জটিলতা নেই, একেবারে সরল, স্নিগ্ধ।

বিনু কেন যেন মুখ নামিয়ে নিল, বলল, "আমাদের অনেক ইয়ে রয়েছে। তুমি বুঝবে না। মা আমার বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায়! আমার বিয়ে হয়ে গেলে মার মাথা থেকে বোঝা নেমে যাবে। মা বাঁচবে।"

বোধন চুপ করে থাকল। সে এ-বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে করতে অনেক কিছু দেখছে। অনুমান করতে পারছে। নিজেকে সামলে নিয়ে বোধন বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর খানিকটা যেন ঠাট্টার গলায় বলল, "তোমার বিয়ে হয়ে গেলে আমার লোকসান হবে। ফাঁকিতে পঞ্চাশটা টাকা পাচ্ছিলাম। আর পাব না।"

বিনু বলল, "পাবে না। আর কাকাও তোমায় কোনোদিন চাকরি করিয়ে দেবে না। কাকা পারে, তবু দেবে না। মা কাউকে এতটুকু ভালবাসলে কাকা সহ্য করতে পারে না।"

বোধন বিনুকে অপলকে দেখছিল।

নয়

সুমতি হাত বাড়িয়ে টাকা দিলেন।

বোধন অবাক হয়ে গেল। মা ভুল করে নি তো?

কোলের ওপর ব্যাগ রেখেই সুমতি আবার একবার ছোট করে হাই তুললেন। চোখের তলা ছল ছল করছে। পাতা ফোলা। মুখটাও ফুলে আছে।

বোধন টাকাটা দেখছিল। পঞ্চাশ টাকার নোট। বাজারের জন্যে পাঁচ টাকাই বরাদ্দ, কোনোদিন বাড়তি কিছু আনতে হলে দু' এক টাকা বাড়ে। আবার যখন টানাটানি থাকে তখন কমেও যায়।

সুমতি বাকি চাটুকু খেয়ে নিলেন।

"মুদির দোকানে যেতে হবে। মুখে বলব, না লিখে নিবি?" সুমতি বললেন।

"মনে থাকবে, বলো।"

সুমতি বলতে লাগলেন: তেল, মুগের ডাল, আখের গুড়, গায়ে-মাখা সাবান একটা, সস্তার কাপড় কাচা গুঁড়ো সাবান, একশো সোডা, এক প্যাকেট ধূপ।

মুদি শেষ করে সবজি বাজারের ফর্দ ধরলেন সুমতি। আলু, আদার পরই জিজ্ঞেস করলেন, "গাঁয়ের চাষীদের কাছ থেকে একটা ফুলকপি নিতে পারবি না? তোরা দরদাম করতে পারিস না। রেবারা টালিগঞ্জ বাজারে এক টাকা পাঁচ সিকেতে কপি কেনে! শীত পড়ে গেল, এখনও কপির অত দাম হবে কেন?"

বোধনের হাসি পাচ্ছিল। মা শাকসবজি যখনই কিছু আলাদা করে আনতে বলে—গাঁয়ের চাষীদের কথা মনে করিয়ে দেয়। চাষীরা তো গাঁয়েরই, কলকাতার কবে হল? তবে এ গাঁ তো খালের পাশে, না হয় নারায়ণপুর আর কেষ্টপুর। তারা চালাক হয়ে গিয়েছে!

সবজি বাজারের ফর্দ মা আরও টুকটাক বলল। দেখিস না যদি চিংড়ি মাছ পাস। ছোট ছোট বাগদা!

"অনেক দাম নেবে।" বোধন বলল "আঠারো কুড়ি।"

"তোদের কাছে সবাই দাম নেয়। রেবা বলছিল, বারো চোদ্দ করে বেচে তাদের বাজারে। এ-বাজারে কি সবই গলাকাটা··· ?"

"মা, তোমার সব কিছুতেই রেবা," চুয়া বলল, সমান্য বিরক্ত হয়েই কাছেই ছিল চুয়া, "রেবা মাসী পাঁচ বললে পাঁচ, সাত বললে সাত। টালিগঞ্জের বাজারটা কি রেবা-মার্কেট! নিজে একদিন বাজারে গিয়ে দেখো না··· ।"

মেয়ের বিরক্তি সত্ত্বেও সুমতি রাগ করলেন না। বললেন, "ওদের দিকের বাজার ভাল। সস্তা। এখানে সব ডাকাত।"

শিবশংকর খবরের কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। আজ রবিবার। অন্যদিন পাঠকবাবু কাগজ পড়া শেষ করে অনেকটা বেলার দিকে পাঠিয়ে দেন শিবশংকরকে। চোখ বুলিয়ে ঘণ্টা খানেক পরে সেটা ফেরত পাঠাতে হয়। টানাটানির সংসারে সুমতি খবরের কাগজের জন্যে বাড়তি খরচ করতে নারাজ। শিবশংকর যে ক্রস ওয়ার্ডের জন্যে ইংরেজি কাগজ কেনেন সেটা ছেলেমেয়ের কাছে চেয়ে চিন্তে। স্ত্রীর মন বুঝে যে দু-এক টাকা না নেন তাও নয়। এনট্রি ফ্রি-র বেলাতেও তাই।

রবিবারের কাগজের ব্যাপারটা আলাদা। ওটা বোধনের।

কাগজ পড়তে পড়তে শিবশংকর বললেন, "চিংড়ি মাছ এখন ফরেনে

চালান যাচ্ছে। বাজারে মাছ আসবে কোথায়? ক' বছর আগে সাত-আট টাকায় ভাল বাগদা, দশ টাকার গলদা পাওয়া যেত মানিকতলা বাজারে।" বলে স্ত্রীর দিকে তাকালেন।

সুমতি বললেন, "সবই বিদেশে যাচ্ছে; এ-দেশে আর থাকবে কি! ভাবলে মাথা গরম হয়ে যায়।...হ্যাঁ গো, তোমার মনে আছে —যে-বছরে আমরা রাজকেষ্টবাবুদের বাড়ি ভাড়া নিলাম—তখন চার পাঁচ টাকায় অঢেল বাজার হত না? পাঁচ ছ' জনের সংসার দুবেলা হেসে খেলে চলে যেত। চার টাকা সাড়ে চার টাকায় বড় বড় পারসে মাছ, সোয়া তিন টাকায় সরষের তেল কিনেছি, খাঁটি তেল, চিনি সাত সিকে। আর এখন—যেমন কয়লা তেমনি তেল ডাল চিনি, সেই রকম শাকসবজি। মানুষ বাঁচবে কি করে?"

"বাঁচাতে চাইছে না তো বাঁচবে!" শিবশংকর বললেন।

বোধন কদাচিৎ, কালেভদ্রে মাকে এমন সহজ, নরম, শান্ত মেজাজে দেখতে পায়। ঘুম থেকে উঠেও মার মুখচোখ প্রসন্ন থাকে না, কেমন এক বিরক্তি, অবসাদ, রুক্ষতা নিয়ে দিন শুরু করে মা। সারা দিন সেটা বাড়ে—বেড়েই যায়—জ্বর বাড়ার মতন, তারপর রাত্রে মা প্রায় বিকারগ্রস্ত রোগীর মতন হয়ে থাকে। আজ মা অন্য রকম। কেন কে জানে! বোধনের ভাল লাগছিল।

সুমতি মেয়েকে বাজার আর মুদিখানার জিনিসপত্র গুছিয়ে দিতে বললেন। "একসঙ্গে আনবি, না আলাদা আলাদা?"

"একসঙ্গেই আনি," বোধন বলল। তেল, ডাল, সাবান—মুদিখানার ফর্দ যতই হোক—সবই দুশো আড়াইশো গ্রামের ব্যাপার। কাজেই অসুবিধের কিছু নেই। এ-বাড়িতে এভাবেই জিনিসপত্র আসে দিন দুই তিন চলার মতন। মাসকাবারী বাজার আগে আসত, বাবার আমলে। এখন আর কেমন করে আসবে!

চুয়া রান্নাঘর থেকে সরষের তেলের শিশি, গুড় আনার জন্যে ছোট টিফিন কৌটো, এটা-ওটা এনে বাজারের থলি সমেত বোধনের হাতে দিল।

"চা কিন্তু নেই আর," চুয়া বলল।

"চা আনিস," সুমতি মাথার চুল মুঠো করে এনে নাকে গন্ধ শুঁকলেন, নিজেই নাক কোঁচকালেন। "একশো বেসম আনিস তো খোকা, মাথা ঘষব!"

বোধন মার চুল দেখছিল। কত চুল পেকে গিয়েছে মার। এখন বুড়ি বুড়ি মনে হয়। অথচ এমন কি বয়েস মা-র! পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ হবে। বিনুর মা মার একেবারে সমবয়সী না হলেও কাছাকাছি তো নিশ্চয়। অথচ বিনুর মার পাশে মাকে অনেক বড় দেখাবে! সচ্ছলতা আর নেই নেই-এর এই তফাৎ বোধ হয়। একজন যতটা সম্ভব নিজেকে রাখতে পারে, অন্য জন পারে না।

বোধন চলে যাচ্ছিল, শিবশংকর স্ত্রীর দিকে তাকালেন, "পাঁচটা সিগারেট হবে না?"

সুমতি প্রথমে স্বামীর দিকে তাকালেন—তারপর ছেলের দিকে। "তোর বাবার ভিক্ষে চাওয়ার বহর দেখেছিস! আনিস। একটা গোটা প্যাকেটই আনিস।..." বলে আবার স্বামীর দিকে তাকালেন. "তুমি চুরুট খেতে পার না? আমাদের ক্যাশের দাসবাবু ছোট ছোট চুরুট খায়। পাঁচ পয়সা না কত যেন। দিনে তিন চারটেতেই কুলিয়ে যায়। তোমার যত বিড়ি-ফিড়ির নেশা। তাও আবার নিবিয়ে নিবিয়ে খাওয়া। কী দুর্গন্ধ। অতই যদি নেশার প্রাণ—পান-জরদা খাও। খোকা, পান আনবি, সুপুরি। অধেক দিন মুখে পান দিতে পারি না।"

বোধন আর দাঁড়াল না। বেলা হয়ে যাচ্ছে। আজ রবিবার।

সবাই হেলেদুলে বাজারে যাবে। মাংসের দোকানে লাইন মারবে, মাছ নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে, কপি কিনবে উবু হয়ে বসে, বেগুন টিপবে খাবার শখ সকলেরই। সাধ্যও অনেকের আছে নিশ্চয়, নয়ত দামের জিনিস বিকোয় কেমন করে? ঘুষবাবুরা সংখ্যায় বাড়ছে মানুষ বাড়ার মতন। একটা স্ট্যাটিকটিস থাকলে হত। গভর্নমেণ্ট কেন ঘুষবাবু ওভারটাইম বাবুদের হিসাব রাখে না।

দোতলা থেকে বোধন নীচে নেমে গেল।

পঞ্চাশটা টাকা মা ঝপ করে বের করে দিল এটাই আশ্চর্যের কোথ্ থেকে পেল মা। পরশু দিনও বলছিল, তিন মাসের ভাড়া বাকি পড়ে গেছে। সরকারী বাড়ি বলে কোনো তাগাদা নেই। এখানে অনেকে পাঁচ সাত এমন কি এক বছরের ভাড়া বাকী রেখেও দিবি বসে আছে। গ্রাহ্যই করে না। ভাবটা এমন, সরকারী বাড়ির আবার ভাড়া কী? কাগজে মাঝেমাঝে বেরোয় লাখ কয়েক টাকা নাকি বাকী পড়ে আছে গভর্নমেন্টের হাউসিংয়ে। বেড়ে আছে সব। গৌরী সেনের বাচ্চা।

মা এতটা সাহস পায় না। সামান্য চাকরি, সহায় বলতে কে নেই, মাস কয়েকের ভাড়া যদি জমে যায় আর দেওয়া হবে না। তখন যদি তাড়িয়ে দেয় বাড়ি থেকে একেবারে রাস্তায়।

এই পঞ্চাশটা টাকা মা নিশ্চয় বাড়তি পেয়েছে। কখন কোথায় টাকা কেটেছিল ফেরত দিয়েছে, কিংবা বাড়তি ডি-এ পেয়েছে হু করে। হয়ত আরও পেয়েছে কিছু। এরকম দু-চার বার মার বরাতে জুটে যায়।

টাকা হাতে এসেছে বলে কি মার মন ভাল? না, তা মনে হয় না। অন্য কারণে হতে পারে, বা এমনিও হতে পারে। প্রত্যহ দুবেলা মানুষ কত আর মন মুষড়ে থাকবে। বোধনদেরও তো এক একদিন

ন বেশ ভাল থাকে। অথচ তার কি মন ভাল থাকার কথা?

"বোধন?"

দাঁড়াল বোধন। তাকাল। গৌরাঙ্গ।

"দেখতেই পাস না?" গৌরাঙ্গ বলল, "তোর জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।"

"দারুণ চড়িয়েছিস!" বোধন হাসল। গৌরাঙ্গ হালকা সবুজ আর হলুদ মেশানো সোয়েটার চাপিয়েছে গায়ে। পুরো হাতা। "খুব শীত পড়ে গেছে, তাই না?" বোধন ঠাট্টা করল।

"নারে, শো দিচ্ছি।"

"দে।"

"চা চলবে?"

"চলতে পারতো। কিন্তু বাজার? দেখছিস তো!"

"রাখ। দশ মিনিটে তোর বাজার উঠে যাবে না। চল্, মেঘার দোকান থেকে দু গ্লাস মেরে নি। তোর সঙ্গে কথা আছে।"

কিছু আসে যায় না পাঁচ দশ মিনিটে। আজ রবিবার। মার কোনো তাড়া নেই। নিজের হাতে সব রান্নাবান্না করবে। অন্য দিন তাড়াহুড়োর মাথায কিছু মা রান্না করে, কিছু চুয়া। জবাদিও করে দেয়। আজ জবাদি নীচের তলা থেকে ফিরে এলে কাজকর্ম শুরু হবে সংসারের। বাটনা বাটা, তরকারি কোটা—জবাদি সামাল দেবে মাকে। চুয়া বসবে কাপড় কাচা নিয়ে। আজ মা আর চুয়ার শাড়ি, জামা, সায়া কাচার দিন। তার সঙ্গে টুকটাক আছে। মুশকিল হল এ-বাড়িতে কাপড় জামা শুকোতে দেবার জায়গা নেই। হয় ছাদে যাও, না হয় খাবার জায়গাটুকুতে কিংবা জানলার শিক বেঁধে ঝুলিয়ে দাও। বড় বিশ্রী ব্যাপার।

মেঘার চায়ের দোকানে চা খেয়ে বোধন আর গৌরাঙ্গ সামান্য

তফাতে দাঁড়াল। রাস্তার ওপর বেঞ্চি ভরতি, এদিক-ওদিকেও চায়ে
খদ্দের দাঁড়িয়ে।

গৌরাঙ্গ বলল, "তোকে একটা খবর দি। বলাইবাবু-
চিনিস তো?"

"বলাই সিংহ?"

মাথা নাড়ল গৌরাঙ্গ। "কাল একটা দরকারে বলাইবাবুর কা
গিয়েছিলাম। আমাদের একটা কেস্ ওঁর কাছে পড়ে আছে চা
মাস ধরে। তা কথায় কথায় বলাইবাবু বললেন, ওঁদের ফা
ঝামেলা বেঁধে আছে। জনা দুয়েক লোককে হটাবেন। তারা গ
গোল করছে বড়। উনি আমায় চেনা-জানা ভাল লোকের ক
বললেন। পাড়ার ছেলে-ছোকরা হলে ভাল হয়। বললেন, আমা
ছোট অফিস। চাকরি যদি দিতে হয়—আমি চেনা শোনা পাড়া
ছেলেকে দেব। তাতে আমার স্যাটিসফেকশন আছে।...তোর ক
আমার তখনই মনে পড়ল।"

বোধন পাড়ার বলাই সিংহীকে চেনে। তাঁর অফিস আছে তা
শুনেছে। কিন্তু কিসের অফিস জানে না। বলল, "বলাই সিংহীর কিসে
অফিস?"

"ক্লেম রিকভারী। মেইনলি ওরা রেলের সঙ্গে কাজ করে। রেলে
কাছে পাওনা ক্লেম্ আদায় করে দেয়। গভর্নমেণ্ট ক্লেমও করে।"

বোধন তেমন কিছু বুঝল না। বলল, "আমায় চাকরি দে
কেন?"

"কেন দেবে না? তুই কোয়ালিফায়েড। স্কুল ফাইন্যাল পা
করে নি এমন লোক দিয়েও কাজ চালায় যখন তখন তোর কেন হ
না? তা ছাড়া তুই পাড়ার ছেলে। তোর কোনো বাজে ব্যাপ
নেই। সবাই বলবে, তুই শালা গুড্ বয়।"

বোধন হাসল। গুড্ বয়?

মেঘার দোকানের বাচ্চাটা চা দিল।

গৌরাঙ্গ চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, "আমি কথাটা বলি? যদি বলিস আজই সন্ধে বেলায় যেতে পারি বলাইবাবুর কাছে।"

"বেশ, বল। আমার আর কি! যা হয় একটা পেলেই হল।"

"মাইনে কিন্তু কম।"

"কত?"

"ঠিক জানি না। তবে ওয়ান টুয়েন্টি ফাইভ কি থারটি ফাইভ হবে। অফিস লালবাজারের মুখে। কম মাইনের জন্যেই অফিসে গণ্ডগোল চলছে।"

বোধন চা খেতে খেতে বলল, "গণ্ডগোলের মধ্যে আমার ঢোকা কি উচিত হবে? তারপর আমাকেই ওরা দালাল বলবে। মারধোর করবে।"

গৌরাঙ্গ তাচ্ছিল্যের মুখ করল। "যা রে শালা, মারধোর করবে। অত সোজা! মালিক যদি কাউকে তাড়ায় সে তারা বুঝবে। ইট্ ইজ নট্ ইওর ফল্ট।...যাক গে, সে বলাইবাবু বুঝবে। তোর কী? তোকে চাকরি দিলে তুই করবি। না দিলে করবি না।"

যুক্তিটা বোধন মেনে নিল। তার সত্যি কোনো দোষ থাকে না।

চা-খাওয়া শেষ হলে গৌরাঙ্গ তাকে সিগারেট দিল।

দু বন্ধু বাজারের দিকে হাঁটতে লাগল। গৌরাঙ্গ হঠাৎ বলল, "পাড়ার খবর জানিস?"

"কেন, কী হয়েছে?"

"গণ্ডগোল চলছে! পলুদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল পুলিস। রজনীরা গিয়ে থানা থেকে ছাড়িয়ে এনেছে। এবার শান্তদের সঙ্গে লাগবে। ভিতরে টেনসন।"

"কবে ধরেছিল পলুদের ?"

"পরশু রাত্তিরে। কাল সকালে ছেড়ে দিয়েছে।"

"শুনি নি। তবে পুলিসের গাড়ি কাল দেখছিলাম।" বোধন দূর তাকাল। বাজার দেখা যাচ্ছে। রাস্তায় এখন শুধু বাজার-যাত্রী।

গৌরাঙ্গ বলল, "তুই ভেবে দেখ, বোধন; এক শালা দমদ লাইনে ছিনতাই পার্টির লীডার। আরেক শুয়ারের বাচ্চা তুবা ডাকাতির কেসে ফেঁসেছে। তুই বান্‌চোতই এখন পাড়ার লেতা জমেছে ভাল।"

বোধন হেসে বলল, "বেশী বলিস না, তোকেই ফাঁসিয়ে দেবে!"

"যা রে শালা, আমায় কি ফাঁসাবে!…নে তুই আলু পটলে চলে যা!—আমি একবার ঠনঠনিয়া যাব। মাসীর বাড়ি।…তা হলে ও কথা রইল।" বলে হাত নেড়ে চলে যাচ্ছিল গৌরাঙ্গ, হঠাৎ ডাকল বোধনকে। বলল, "তোর বোনকে বলবি, অত রাত করে যেন ন ফেরে। বাস স্টপের পাশে তেঁতুল তলাটা ক্রিমিন্যালদের আড্ড হয়ে গিয়েছে! সেদিন মিনিবাসে একসঙ্গে ফিরেছি। ওকে রিকশা কর নিয়ে এসেছি।…কোথায় যায় ও ?"

বোধন যেন ঘা খেল। "থিয়েটারের শো ছিল বোধ হয়!"

"তোর বোন থিয়েটার করে! বলিস কি রে! জানতাম না তো!"

বাজার থেকে বাড়ি ফিরে এসে বোধন দেখল, বাড়িতে খু হাসাহাসি চলছে। মা হাসছে, বাবাও। চুয়াও হাসছিল। জবাদি মাথার কাপড় কপাল পর্যন্ত টেনে ঘর ঝাট দিচ্ছে। কী নিয়ে হাসাহাসি তা অবশ্য বোধন বুঝল না। কিন্তু এ-বাড়িতে এম উদোম হাসি ন'মাসে ছ'মাসেও বড় শোনা যায় না।

বোধন মুদির বাজার টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল, সবজি বাজার

রেখে এল রান্নাঘরের কাছে।

সুমতি শাড়ি, সায়া একপাশে জড় করে রাখছিলেন। কাচা-কাচিতে দেবেন। চুয়া জানলার কাছে দাঁড়িয়ে।

বোধন বলল, "মা, আমি কিন্তু দেড় টাকা বেশী খরচা করে ফেলেছি। সে-রকম মাছে এক টাকা বাঁচিয়েছি।"

"কী কিনেছিস?"

"সত্যনারায়ণ গরম শিঙাড়া ভাজছিল। জিলিপিও গরম ছিল। মিলিয়ে দেড় টাকার নিয়েছি!" বোধন জানে মা গরম জিলিপি খেতে খুব ভালবাসে!

সুমতি বললেন, "ভালই হয়েছে।" বলে স্বামীকে দেখালেন, "তোর বাবাকে খাওয়া। কী মানুষ নিয়ে ঘর করলাম ভগবানই জানেন।"

বোধন কিছু বুঝল না। মা হাসি-খুশি মুখে কথা বলছে; রাগ নেই জ্বালা নেই, বরং চোখভরা কৌতুক।"

"কেন? বাবা— ?"

সুমতি আঙুল দিয়ে টেবিলের দিকটা দেখালেন। "তোর বাবা গায়ে দেবার শাল তৈরী করেছে। দেখ। চুয়া, দেখা তো খোকাকে।"

চুয়া টেবিলের সামনের চেয়ার থেকে একটা রংচঙ্গে কি তুলে নিল। নিয়ে উঁচু করে বুকের কাছে নিয়ে মেলে ধরল। বোধন অবাক হয়ে দেখল, বাড়িতে যত পুরোনো ছেঁড়া পেঁজা শাল ছিল বাবা তার আস্ত জায়গাটুকু কেটে নিয়ে অন্য শালের সঙ্গে জুড়েছে। বাদামী, কালো, সবুজ সব মিশিয়ে সে-এক বিচিত্র চেহারা হয়েছে।

সুমতি হাসতে হাসতে বললেন, "এই জিনিস গায়ে দিয়ে কাল শুয়েছিল। বলে বাড়িতে থাকে, ওটা গায়ে দিয়ে শীত কাটিয়ে দেবে।"

বোধন হাসতে পারল না। শীত পড়ছে। মা কবেকার একটা রং-

মরা মেয়েলী সস্তা শাল গায়ে জড়িয়ে অফিস যায়। বাবা খদ্দরের মোটা চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে থাকে। বোধনের একটা কালো রংয়ের সোয়েটার আছে—যা আর পরা যায় না। আর চুয়া বাইরে আসা-যাওয়া করে বলে সেদিন একটা নতুন কি কিনেছে। সস্তার জিনিস। হয়ত তাকে কেউ দিয়েছে।

বাবা অব্যবহার্য পুরোনো জিনিস যোগাড় করে শীত বাঁচাবার চেষ্টা করছে। সামনেই শীত। এই শীত কি যাবার ?

দশ

বোধন ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙ্গার পরও তার মনে হচ্ছিল, এখন মাঝ রাত। সবই অন্ধকার হয়ে আছে। মা-বাবা তাদের ঘরে ঘুমোচ্ছে ; বোধন নিজের ক্যাম্প খাটে শুয়ে। এই আচ্ছন্নতা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কেটে গেল, তাকাল বোধন। চুয়া শাড়ির পায়ের দিক ঠিক করে নিচ্ছে।

খেয়াল হল বোধনের, এখন দুপুর। হয়ত বিকেল হয়ে আসছে। সে চুয়ার বিছানায় শুয়ে কাগজপত্র পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

তেষ্টা পাচ্ছিল বোধনের। "এক গ্লাস জল খাওয়াবি ?"

চুয়ার তখনও যেন কিছু বাকী। "আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে…" বলতে বলতে বাইরে চলে গেল চুয়া।

বোধন শুয়েই থাকল। খাওয়া-দাওয়া শেষ করতে বেলা হয়েছে। মা আজ তিন চার রকম রান্না করছিল, সাধারণ রান্না। খেতে বেশ হয়েছিল ! মাছ টাছ মা একসময়ে সত্যি ভাল রাঁধত, এখন কালেভদ্রে সে-রকম রাঁধে।

জল এনে দিল চুয়া।

বোধন উঠে বসল। জল খেল। "কোথায় যাচ্ছিস ?"

"আজ আমার টানা রিহার্সাল !" চুয়া বলল। তাকের ওপর রাখা আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে কপালের চুল ঠিক করল।

"কোথায় ?"

"অনেক দূর যেতে হবে—সেই ভবানীপুর," বলতে বলতে চুয়া

মুখে একটু পাউডার মাখল, মুছল। কোথা থেকে লিপস্টিক বার করে ঠোঁট রং করতে লাগল।

"তুই আজকাল লিপস্টিকও চালাস?"

"বা, ঠোঁট ফাটে না?"

"আজ কোন অফিসের থিয়েটার?"

"বললাম না রিহার্সাল। অফিসের নয়, আমাদের ক্লাবের।"

"তোর আবার কোন ক্লাব?"

চুয়া নাম বলল। বোধন শোনে নি নামটা, জানেও না। তার কোনো আগ্রহ নেই জানার। বোধন বোনের সাজগোজ দেখছিল। মন্দ দেখাচ্ছে না চুয়াকে। পিঠময় চুল ছড়ানো। বিনুনি করে নি। শাড়িটা নির্ঘাত মার। চওড়া পাড়। পুরোনো নিশ্চয়? মার একসময় ভাল ভাল শাড়ি ছিল, তার দু-একটা ছেঁড়া পেঁজা হয়েও থেকে গেছে এতদিন।

"শোন্," বোধন বলল, "তুই একেবারেই রাত করে ফিরবি না। পাড়ায় একটা গণ্ডগোল বাধতে পারে। গৌরাঙ্গ বলছিল।"

চুয়া লিপস্টিক রাখল। "বাধলে আর কি করব! তা বলে সন্ধের মধ্যে বাড়ি ফিরতে পারব না।"

বোধন বিরক্ত হল। "কেন পারবি না? একটা ঝামেলার মধ্যে পড়ে গেলে তখন কী হবে?"

চুয়া তৈরী। গায়ের শাল নিল। তার ব্যাগ। বলল, "এত লোক আসছে যাচ্ছে তারা ঝামেলায় পড়ছে নাকি? অত ভয় করলে কলকাতায় চলাফেরা করা যায় না?"

বোধনকে তেমন গ্রাহ্য করল না চুয়া, চলে গেল। সদর দিয়ে যাবার সময় চেঁচিয়ে বলল, "জবাদি, দরজা বন্ধ করে দিও।"

বাড়িতে কারও গলা পাওয়া যাচ্ছে না। মা নিশ্চয় ঘুমোচ্ছে।

বাবা কোথায়? বাবাও কি শুয়ে আছে? জবাদি বাসনপত্র মাজতে বসেছে। বাসন মেজে, ঘর মুছে চলে যাবে জবাদি। ক'টা বাজল? এ-ঘরে ঘড়ি নেই। মার ঘরে একটা টাইমপিস আছে। সেটা কোনো রকমে চলে। মার নিজেরও ঘড়ি নেই, বাবার একটা ঘড়ি ছিল। সেটা বোধ হয় কোনো সময়ে বেচে দেওয়া হয়েছে।

জানলার আলোর দিকে তাকিয়ে বোধন সময় অনুমানের চেষ্টা করল। শীতের দুপুর। আলো দেখে কিছু আন্দাজ করা যায় না। তবে তিনটে হবে। খাওয়াদাওয়া শেষ করতেই তো দেড়টা বেজে গিয়েছিল। তারপর এক দেড় ঘণ্টা নিশ্চয় কেটেছে।

তক্তপোশ ছেড়ে উঠে পড়ল বোধন। বাইরে এক নাগাড়ে কাক ডাকছে! মাঝে মাঝে চড়ুইয়ের কিচকিচ। জবাদি বাসন মাজছে, তার শব্দও এক আধবার কানে আসছে। একবার বাথরুম যেতে হবে। জবাদি বাসন মেজে না বেরুলে যাওয়া যাবে না।

বোধনের একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে হল। আজ যখন বাবার জন্যে এক প্যাকেট সস্তা সিগারেট কিনল বোধন তখন নিজের জন্যেও খুচরো তিনটে কিনেছিল। দুটো শেষ হয়েছে, একটা আছে। বাবা যদি না জেগে উঠে বাইরে এসে বসে থাকে এতক্ষণে বোধন একটা সিগারেট খেতে পারে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে। দেশলাই রান্নাঘরে পাবে।

ঘরের বাইরে এল বোধন। খাবার জায়গাটায় আগাগোড়া শাড়ি সায়া জামা মেলা, শুকোচ্ছে সব। টেবিলটা আড়াল পড়ে গিয়েছে।

বোধন শুকনো, আধ-শুকনো জামা কাপড় সরিয়ে রান্নাঘরে গেল। জবাদি কল খুলে বাসন ধুচ্ছে। জল পড়ার শব্দ হচ্ছিল।

দেশলাই নিয়ে ফিরে আসার সময় বোধন দেখল, মার ঘরের

দরজা অর্ধেক ভেজানো। বাবা এখনও ওঠে নি। দুপুরে বাবা বড় একটা ঘুমোয় না, শুয়ে থাকে, না হয় খুটখাট কিছু একটা করে। এখন কোনো রকম সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

আজ তারা সকলেই কার মুখ দেখে যে উঠেছিল কে জানে এমন ভাল দিন যদি মাঝে মাঝে আসত তবু বোঝা যেত বাড়িতে কিছুটা সুখ শান্তি আছে। কিন্তু আসে কোথায় ?

ঘরে এসে বোধন জামার পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরাল ধরিয়ে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাল। রোদ একে বারেই জ্বলজ্বল করছে না; মানে, তাত নেই। রং আছে, আর খানিকটা পরে রং-ও মরে আসবে। নীচের মাঠটুকুতে মণ্টুটণ্টুর ক্রিকেট খেলছে। বাচ্চা বাচ্চা ছেলে। পাখিও ওদের সঙ্গে ভিড়ে গেছে। ফ্রক দুলিয়ে ছুটছে, বল কুড়োচ্ছে। হাসি পেল বোধনের খেলুক। আজকাল মেয়েরাও ক্রিকেট ফুটবল খেলছে ভাল।

বাচ্চা বয়েসটা বেশ ভাল। কোনো ঝঞ্ঝাট ঝামেলা নেই, দুশ্চিন্তা নেই। বোধনরাও ওই বয়েসে শুধু নয় ওর চেয়েও বড় বয়েসে পাড়ার মধ্যে ক্রিকেট খেলেছে। একবার তো তার বল লুফতে গিয়ে লাইট পোস্টের সঙ্গে ধাক্কা লেগে নাকই ফেটে গেল। গলগল করে রক্ত কিছুতেই রক্ত বন্ধ হয় না। হাসপাতালে গিয়ে নাক প্লাগ করতে হল মার সেকি অবস্থা তখন, ভয়ে তটস্থ, একদিকে কাঁদছে অন্য দিকে বোধনকে গালাগাল দিচ্ছে। বোধন তখন একেবারে কচি খোকাটি নয়, ক্লাস সেভেন এইটে পড়ে। মা ছেলেকে কোলের কাছে নিয়ে শুয়েছিল সারা রাত। বাবা পরের দিনই ভাল ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। তখন থেকে বোধনের নাকের হাড় সামান্য বেঁকে আছে। থাকুক। কি আর করা যাবে!

সংসারে তখন সবই অন্যরকম ছিল। সকাল শুরু হত ঝরঝরে

চেহারায়। বাবা চা খেয়ে বাজারে চলে যেত, ঝি কাজ করত বাড়ি-রের, মা বাসী কাপড় বদলে সংসারের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ত, ধ জ্বাল দিচ্ছে, চাল মেপে নিচ্ছে, দিদি টুকটাক ফাই ফরমাশ খাটছে। বাবা বাজার নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আরও যেন জোর কদমে ছুটতে লাগল সংসার। বাবা বাজার ফিরতি জিলিপি, কচুরি না হয় রুটি-মাখন নিয়ে আসত। জল খাবারের সঙ্গে দুধ। দুধ খাওয়া নিয়ে মার সঙ্গে লড়াই। মার তখন মরার ফুরসত থাকত না। বাবা দাড়ি কামাতে ব্যস্ত! শীতকাল হলে তেতলার চাতালে। দাড়ি কামাতে কামাতে মা সঙ্গে কথা বলত।

মা তখন কেমন ছিমছাম ছিল। পরিষ্কার গায়ের রঙ, আধো-ভারী চেহারা, হলুদ আর টিয়া-সবুজ শাড়ি পরতে বেশী ভালবাসত মা, ছোট ছোট হাতের জামা পরত, চেপ্টা মোটা বিনুনী খোঁপা থেকে আধ-ঝোলা হয়ে পড়ে থাকত কাঁধে। কাজ করতে করতে যখন-তখন চা খেত গরম করে। বাবার সঙ্গে ঝগড়াও করত, 'কেন, টিফিনে দুটো টোস্ট খেয়ে পয়সা বাঁচিয়ে আমায় রানী করছ নাকি? কখন দু মুঠো ভাত নাকে মুখে গুঁজে ছোট, টিফিনে ভাল করে খেতে পার না। ডিম খাবে, কলা খাবে···। যাতে উপকার তাই খাবে।' বাবা গোঁফ ছাঁটতে ছাঁটতে নাক কুঁচকে বলত, 'কলা আমার সহ্য হয় না।' 'তা হলে একটা মিষ্টি খেয়ো।' 'ঘরে বাইরে কত মিষ্টি খাব।' বাবার গলায় হাসি।

সেই মা কোথায় হারিয়ে গেল, কোথায় যেন মরে গেল সেই বাবা। যা জীবন্ত ছিল তখন, আজ তা মৃত। এখন মাকে দেখলে কেউ বলবে না মা কোনোদিন স্বাস্থ্যবতী, সুশ্রী, সাদামাটা বউ ছিল বাড়ির। মাকে এখন বিশ্রী মোটা, ফোলা, খড়ির মতন সাদাটে, কাঁচা পাকা চুলের এক বুড়ির মতন দেখায়।

সবই দুর্ভাগ্য! বাবা, মা, ছেলে মেয়ে সকলের দুর্ভাগ্য। বাবার যদি চাকরি না যেত, দুর্ঘটনা না ঘটত আজ সংসারের এ অবস্থা হত না তারা মোটামুটি সুখ-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারত। অন্তত আজ যে-ভাবে আছে—এর চেয়ে নিশ্চয় ভাল। মা ঠিকই বলে ঃ বলে বাবার হাত ধরে এ-বাড়িতে শনি ঢুকেছে, এ-আর ছাড়বে না।

সিগারেট শেষ হয়ে এসেছিল। বোধন আরও দু-একটা টান দিল দিয়ে জানলার বাইরে ফেলে দিল। ভাল লাগছিল না। আজ সন্ধের দিকটা তার ফাঁকা। বিকেলেও কিছু করার নেই। কোন দিন ব থাকে। তবু অন্য দিন সুকুমারদার দোকানে গিয়ে বসে থাকা যায় আজ রবিবার। দোকান বন্ধ। সুকুমারদাকে বাড়িতেও পাওয়া যাবে না, বউদিকে নিয়ে চাঁপাতলায় গিয়েছে শ্বশুরবাড়ি। পাড়ার বন্ধুদের মধ্যে আর যারা দু একজন—তারাও কেউ বসে থাকবে না পাড়ায় কেউ সিনেমায় গিয়েছে, কেউ বা আড্ডা মারতে বেরিয়ে পড়েছে।

বোধনের হঠাৎ মানিকতলার কথা মনে পড়ল। কত দিন যাওয়া হয় নি। মাস আড়াই তো হবেই। আজ গেলে হয়। আশিসকে নিশ্চয় পাওয়া যাবে। আশিস খুব ঘরকুণো। তা ছাড়া ওর বাড়িতে একটা আড্ডাখানা আছে। পূর্ণ, টুকুন—সবাই জমায়েত হয়। বোধন নিশ্চয় কাউকে পেয়ে যাবে। তা ছাড়া আজকের কাগজে সে দু তিনটে বিজ্ঞাপনের মধ্যে একটা বিজ্ঞাপন দেখে সন্দেহ করছে, কে পি ওয়ার্কস আশিসের মামাদের হবে। রাবারের কারখানা আশিসের মামাদের ছিল, ওই রকম—নারকেলডাঙ্গায় না রাজাবাজারে। রবিবারের একটা ইংরিজী কাগজ বোধন নেয় চাকরির বিজ্ঞাপন দেখার জন্যে। আজকের কাগজের সে কে পি ওয়ার্কস দেখেছে। চাকরিটার খোঁজ নেওয়া দরকার। গৌরাঙ্গ বলাইবাবুর কথা বলেছে—সেটা এখনও জলে পড়ে কথাবার্তা বলুক গৌরাঙ্গ। তারপর যদি ডাক পড়ে বোধনের নিশ্চয়

যাবে। দু একটা টাকা হয়ত অন্যদের কাছে কিছু নেয়—বোধনদের কাছে তার দাম আছে।

না, আজ আর এ-পাড়ায় নয়, মানিকতলাতেই যাবে বোধন। বাস ভাড়া তার কাছে আছে। তা হলে আর দেরি করা কেন, বেরিয়ে পড়লেই হয় হাত মুখ ধুয়ে।

বোধন বাইরে এল। জবাদি রান্নাঘরে ঢুকছে। বাবার গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল ঘরে।

বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বোধন বলল, "আমি চোখে মুখে একটু জল দিয়ে আসছি। তুমি শুকনো শাড়িগুলো তুলে নাও না, জবাদি। হাঁটা যায় না।"

বাথরুম থেকে ভিজে মুখে বেরিয়ে বোধন দেখল, জবাদি শাড়ি তুলে নিচ্ছে। বাবার গলা পাওয়া যাচ্ছিল ভেতরে।

"ক' দিন ছুটি নাও না," বাবার গলা! "ঘুমটুম হলে, বিশ্রাম নিলে সেরে যাবে।"

"এত ঘুমোই, আর কত ঘুমোবো!"

"কোথায় ঘুমোও! ছটফট করো সারা রাত। সাউণ্ড স্লিপ দরকার। বয়েস বেড়েছে পরিশ্রম হচ্ছে… ।"

"আর পারি না। শরীরের মধ্যে কেমন যেন হয়। মাথা তুলতে ইচ্ছে করে না, ঘাড় টনটন করে। একদিন হুট্‌ করে মরে যাব।"

"পাগল!…মরে যাবে!"

"মরেই তো আছি। না হয় বরাবরের জন্যে মরব। তোমার মতন খোঁড়া, অকর্মণ্য মানুষটার তখন কি হবে তাই ভাবি।"

বোধন আর দাঁড়াল না, সরে গেল।

এগার

বিডন স্ট্রীট দিয়ে খানিকটা এগুতেই দেখা। মুখোমুখি।

"বোধন," নীলিমা ডাকল।

নীলিমাকে দেখেই মনে হল হাসপাতাল থেকে ফিরছে ও।

বোধন হাসির মুখ করল। "এই তো। ডিউটি থেকে ফিরছ?"

মাথা নাড়ল নীলিমা। "এদিকে কোথায়? পথ ভুলে?"

"আশিসের কাছে এসেছিলাম। নেই। ওরা নাকি বাড়িসুদ্ধু মধুপুরে বেড়াতে গিয়েছে পরশু।"

"আর কাউকে পেলে না?" নীলিমা ফুটপাথের দিকে আরও একটু সরে দাঁড়াল।

"গজেনকে পেয়েছিলাম। ও আবার শোভাবাজার যাচ্ছে…।"

নীলিমা বলল, "ফিরে যাচ্ছ তা হলে?"

"ভাবছিলাম। ফিরে না গিয়ে কি করব?"

"মাসীমারা কেমন আছে?"

"ওই যেমন থাকে।"

"মেসোমশাই? চুয়া?"

"চলছে সব।…তুমি কেমন আছ?"

"আমারও চলছে।"

নীলিমা বলল, "তা এসেছ যখন—চলো, আমার বাড়িতেই বসবে।"

বোধন বোধ হয় এটা আশা করে নি। দেখল নীলিমাকে। "তুমি

াবে ডিউটি থেকে ফিরছ।"

"তাতে কি।...পাড়ায় এসে ফিরে যাবে, পাড়ার বদনাম।" নীলিমা হাসল, "আস তো না। ভুলেই গিয়েছ। চলো।"

বোধন এড়িয়ে যাবার উপায় দেখল না, ইচ্ছেও হল না। বাড়ি ফিরে গিয়েই বা কী করবে? বলল, "চলো। তোমাদের এখানে লোড শেডিং হচ্ছে না?"

"কোথায় না হচ্ছে। তবে এখন বেশির ভাগ দিন সন্ধেবেলায় থাকে, রাত্তিরে যায়।" নীলিমা হাঁটতে লাগল। বোধন পাশে পাশে।

নীলিমা থাকে প্যারী রোয়ে। বোধন বাড়ি চেনে। আসা-যাওয়া ছিল একসময়ে। নীলিমাকে কেমন যেন লাগত বোধনের। কালো রঙ গায়ের, গড়নে একেবারে ছিপছিপে, মুখের ধাঁচ বেশ লম্বা, বড় বড় চোখ—যেন দুটো ঝকঝকে চোখ ঠেলে নাক ছুঁয়ে ফেলছে। গালে ব্রণ, ব্রণের গর্ত। মস্ত কপাল। সমস্ত চুল একেবারে টেনে বাঁধত। কপাল তাই লম্বা দেখাত আরও। এখনও সেইভাবে চুল বাঁধে। নীলিমার চেহারায় কী আছে বোধন বুঝতে পারত না। কিন্তু আকর্ষণ অনুভব করত। ঠাট্টা করে পাড়ায় তাকে বোধনরা বলত, ব্ল্যাক বিউটি।

"তুমি একেবারেই আর এদিকে আস না?" নীলিমা জিজ্ঞেস করল।

"খুব কম। এসে কি করব বলো! কাউকে পাব না। শুধু শুধু বাস ভাড়া খরচা করে আসা আর ফিরে যাওয়া।"

নীলিমা ঘাড় বেঁকাল। "তুমি যা মিথ্যেবাদী হয়েছ।"

"মিথ্যেবাদী! কেন?"

"তোমার সঙ্গে সেই যে কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে একদিন দেখা হল, বললে সামনের রবিবারে আসবে। এলে?"

বোধন ঘাড় চুলকে হাসল। না, সে আসে নি। নীলিমা ঠিক
বলেছে, মাস চার পাঁচ আগে একদিন দেখা হয়ে গিয়েছিল কলেজ
স্ট্রীটে। বোধন ব্যাংকিং পরীক্ষা দেবে বলে একটা বইয়ে খোঁজে ও
পাড়ায় গিয়েছিল। ফেরার সময় দেখা। বলল, "বলেছিলাম
তারপর নানা ঝঞ্ঝাটে পড়ে গেলাম!"

"তোমার ঝঞ্ঝাট ···কিছু করছ?"

"না। একেবারে বেকার।"

"সেই পরীক্ষার কি হল? বলছিলে যে?"

"কিছু হয় নি।"

বড় রাস্তা শেষ করে গলি। এ-পাড়া একদিন বোধনেরই ছিল
সবই নখদর্পণে। এখানে এলে কখনও কখনও বোধনের মনে হয়, এমন
কিছু হয় না আচমকা, ম্যাজিকের মতন, বোধনরা আবার এখানে
ফিরে আসে।

সরু গলি। রিক্‌শা যাচ্ছে। আলোও জ্বলছিল। খানিকটা এগিয়ে
নীলিমাদের বাড়ি।

বোধন বলল, "তোমার জামাইবাবুর খবর কী?"

কথার জবাব দিল না নীলিমা সঙ্গে সঙ্গে। পরে বলল, "ভি
আবার। জপতপ, তেলক কাটা, এটা ওটা সবই চলছে। আজকা
আবার মাঝে মাঝে ক্যানিংয়ের দিকে কোথায় যায়! সেখানে ও
চেলারা আশ্রম খুলে দিয়েছে।" বলে নীলিমা বোধনের কনুয়ের কাছ
ধরল। হাসল যেন, "তোমার ভয় নেই। জামাইবাবু আজ তিন চার
দিন নেই। সাধনা করতে গিয়েছে।"

আরও কয়েক পা এগিয়ে নীলিমাদের বাড়ি। নীচের তলায় ভুজি
অলা গিরিধারী থাকে বউ বাচ্চা নিয়ে, তার বউ তিন মনী লাস নিয়ে
মুড়ি-ছোলা ভাজে সারাদিন, প্রচণ্ড চেঁচায়। অন্যদিকে থাকে কলমিস্ত্রি

অখিল। অখিলকে লোকে বলে লাট্টু মিস্ত্রী। দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত নেশা খায়। আর পান। পাড়ায় সন্ধেবেলায় কোনোদিন যদি দেখাও যায় তাকে—লোকটাকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা যাবে না।

দোতলায় থাকে নীলিমারা। নামেই দোতলা। ভাঙা সিঁড়ি, কড়িবরগা ফাটা ছোট ছোট ঘর, হাত কয়েকের বারান্দা। তার এক-পাশে কাঠের তক্তা মেরে রান্নাঘর করা। অনেকদিন আছে নীলিমারা।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে নীলিমা প্রথমে একটা ভাঙা টিনমারা দরজা খুলল। এটা আগে ছিল না।

বোধন হেসে বলল, "গেট করেছ?"

"না করে উপায় কি! সারাদিন যদি কেউ না থাকে বাড়িতে তাহলে···।"

নীলিমা নিজের ঘরের তালা খুলে বাতি জ্বালাল। "এসো।"

ভেতরে ঢুকল বোধন। জিনিসপত্রে ঠাসা। কোনোটাই বহুমূল্য নয়, হবার কথাও না। নীলিমার যাবতীয় যা কিছু সবই জড় হয়ে আছে। "জানলাটা খুলেদি, কেমন? ঘরে একটু বাতাস ঢুকুক।"

বেতের মোড়া এগিয়ে দিল নীলিমা। "বসো।"

শীতের ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল ধীরে ধীরে। বাতাস বোঝা যায় না। ঠাণ্ডা বোঝা যায়।

"চা খাবে না?" নীলিমা বলল।

"খাব না কেন?" বোধন ঠাট্টা করল, "যা খাওয়াবে খাব। বাস-ভাড়া ওসুল করতে হবে না!"

"তাহলে বসো! আমি কাপড়টা ছেড়ে নি।" বলে কাপড়-চোপড় উঠিয়ে নিয়ে নীলিমা বারান্দায় চলে গেল।

নীলিমা বোধ হয় বারান্দায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কাপড় ছাড়ছিল। বারান্দা থেকেই বলল, "তেলেভাজা খাবে? হাঁতুর তেলেভাজা।"

"সে তো রাস্তায় !"

"আমি নিয়ে আসব।...বাব্বা, পাড়ার পুরোনো লোক, বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছ। মান্যগণ্য অতিথি।"

"ঠাট্টা করছ ?"

নীলিমা কাপড় ছেড়ে ঘরে এল আবার। হাতে পুঁটলি করা ছাড়া কাপড়। রাখল। বলল, "একটু চুপ করে বসে থাকো, আমি নীচে থেকে তেলেভাজা আর চা একসঙ্গে নিয়ে আসি। বাড়িতে আর কেন চা করি, কি বলো !"

বোধন গাল চুলকে নিল। "দেরি করবে ?"

"পাঁচ দশ মিনিট। এখন সাতটাও বাজে নি। তোমার এত তাড় কিসের। বসো না তুটো সুখত্বঃখের গল্প করি। অনেক কথা আছে।"

বোধন হাসল। "তা নয়। আমি বসতেই পারি। তুমি আর জিরোতে পারছ না... ।"

নীলিমা পয়সা নিল। তারপর ঘরের এক পাশ থেকে কলাইয়ের একটা মগ। চটি পায়ে দিয়ে চলে গেল।

বোধন বসেই থাকল। পকেটে সিগারেট নেই। থাকলে খাওয় যেত।

নীলিমার কথাই ভাবছিল বোধন। এই পাড়ায় বোধনরা আসার পর থেকেই দেখছে নীলিমাকে। বোধনদের লাহাবাবুর ফ্ল্যাট-বাড়ি বাচ্চা বাচ্চা সমবয়সী বন্ধু ছিল নীলুর। খেলতে যেত। বোধনে সমবয়সী। দিদির সঙ্গেও ভাব ছিল নীলুর। চুয়া খানিকটা ছোট বলে তেমন পাত্তা পেত না নীলুদের। নীলুর মা ছিল না, বাবা ছিল। বাব আর দিদি। দিদি অনেক বড়। অণিমাদিই সব দেখাশোনা করত অণিমাদির বিয়ে হল। তারপর নীলুর বাবা মারা গেল। বাবা মা

যাবার পর নীলুরা প্যারী রোয়ে চলে যায়। দিদিই মানুষ করেছে নীলুকে। দিদি বেঁচে থাকতেই নীলু নার্সিং পাস করে ফেলেছে। দিদিও একদিন চলে গেল। এখন নীলু একা। তার জামাইবাবু এক-সময় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কেরানীগিরি করত। সব ছেড়েছুড়ে এখন ধর্ম করে।

নীলুর সঙ্গে বোধনের একসময় মেলামেশা ছিল। ভাল লাগা-লাগির ব্যাপারও ছিল দুজনের মধ্যে। এমন কি বোধন যখন পাড়া ছেড়ে চলে গেল তখনও প্রথম প্রথম সে নীলুর টানে এখানে আসত। কলেজে পড়ার সময়ও নীলুর সঙ্গে মাখামাখি রেখেছিল। ধীরে ধীরে টান কমে গেল। তবু, নীলু অনেকটা তার ছেলেবেলার বন্ধুর মতন, আবার খানিকটা অন্যরকম।

সিঁড়িতে চটির শব্দ পাওয়া গেল, নীলু আসছে।

ঘরে এসে নীলিমা বলল, "তোমার কপাল ভাল, হাঁদু সবেই কড়া থেকে আলুর চপ নামিয়েছে আমি গিয়ে হাজির। খুব গরম।"

ঘরের কোণ থেকে কাচের প্লেট কাপ নিয়ে নীলিমা কুঁজোর জলে সব ধুয়ে নিল। আলুর চপ আর চা দিল বোধনকে। নিজেও নিল। নিয়ে বিছানায় বসল।

হাঁদু দারুণ তেলেভাজা করে। তেলেভাজার দোকান চালিয়ে সিঁথিতে জমি কিনেছে বলে গুজব। বোধন আরাম করে তেলেভাজা খাচ্ছিল।

নীলিমা খেতে খেতে বলল, "আর কি খবর, বলো?"

"খবর!...খবর আর নতুন কি থাকবে?"

"তোমাদের বাড়িতে একদিন যেতে খুব ইচ্ছে করে। জায়গাটা ঠিক চিনি না!"

"বাসে উঠবে, চলে যাবে। কঠিন কিছু নয়!"

"তুমি আস না, আমি কেন যাব ?"

বোধন একটা চপ প্রায় শেষ করে এনে দু চুমুক চা খেল "পকেটে বাসভাড়া থাকে না, ভাই।" ঠাট্টা করে বলল, বলে হাসল।

নীলিমা বোধনকে ভরা চোখে দেখছিল। বলল, "এতদিনে একটা চাকরি যোগাড় করতে পারলে না ?"

"দাও না একটা।"

"আমি চাকরি দেবার মালিক ?"

"সবাই ওই কথা বলে, নীলু। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। চাকরির বাজার তুমি জান না।"

"বেশ জানি," নীলিমা বলল। তার চপ খাওয়া শেষ। সে একটাই নিয়েছিল। চায়ের কাপে মুখ দিল। "তবু লোকে একেবারে পাচ্ছে না তাও নয়। চেষ্টা করো আদা জল খেয়ে।"

বোধন হাসল। "কিছু না খেয়েই করছি। তবু জুটছে না।" একটু থেমে বোধন আজ আশিসের কাছে আসার আসল কারণটা বলল।

নীলিমা কিছু ভাবছিল। সামান্যক্ষণ দুজনেই চুপচাপ।

বোধন ফাজলামির গলায় বলল, "এবার চুরি-চামারির লাইনে নেমে যাব।" বলেই নিজের হাত পা দেখল দু পলক। "শরীরটাও তেমন মজবুত নয়। ল্যাকপেকে তাই না ? চলবে এতে ?"

নীলিমা জোরে হাসল না। বলল, "সাহসও নেই। চুরি গুণ্ডামিতেও সাহস লাগে।"

বোধনের হঠাৎ কেমন বিনুর মার কথা মনে পড়ে গেল। বিনুর মা অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন। তাঁর গলায় হার, হাতে চুড়ি। আলমারির চাবি আলনার কাছে পড়ে। বোধন ইচ্ছে করলেই টাকা পয়সা সোনাদানা কিছু সরাতে পারত। পারে নি কেন ? সাহসে কুলোয় নি ? হয়ত তাই, কে জানে ! বোধনের সেদিন আরও একটা

লাভ এসেছিল বিনুর মাকে দেখতে দেখতে। ঘামে জলে ভেজা আধ খোলা জামাটা তাকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছিল। কেন বিনুর মার গা ক এখনও দেখতে ভাল। কত ভাল। কেন তার মায়ের নয়।

নীলিমা বলল, "করবে চুরি?" এমন আচমকা নীলিমা বলল যে বাধন শুনতে পেল না।

তাকাল বোধন।

"বলছি, চুরি করবে?" নীলিমা বলল।

বোধন অবাক হল। নীলিমাকে দেখছিল বোকার মতন।

"করলে বলো, ব্যবস্থা করে দেবার চেষ্টা করব।" ঠাট্টা করেই বলল কেনা নীলিমা কে জানে।

নীলিমা এবার বিছানা থেকে উঠে দেরাজের কাছে চলে গেল। কিছু হাতড়াল। ফিরে এল। হাতে সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই। খাবে?"

"তুমি সিগারেট খাও? বোধন বিমূঢ় বোধ করছিল।

"আজকাল খাই। আগে একআধটা খেতাম। এখন দিনে আটটা শটাও খাই।" নীলিমা বোধনকে একটা সিগারেট দিল।

বোধন তখনও যেন বিশ্বাস করছিল না।

নীলিমা নিজের সিগারেট ধরিয়ে নিল। ধোঁয়াও গিলল।

বোধন কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে তার বাকী চা-টুকু শেষ করল।

"তা হঠাৎ সিগারেট টানা শুরু করলে কেন?" বোধন বলল।

"এমনি। অনেকেই তো খায়। কম খাটুনি! ক্লান্তি লাগে। খাই। খেলে ভাল লাগে। তাছাড়া বাড়িতে যখন থাকি একা একা, যতক্ষণ আর চুপচাপ, একেবারে একা চুপচাপ ভাল লাগে! ওই সিগারেট খাই।"

"তোমার জামাইবাবুর সামনে ?"

"হ্যাঁ। আড়ালে কেন খাব! জামাইবাবুর আবার নেশাভা পছন্দ।" নীলিমা হাসল।

বোধন দেশলাই চাইল। "তুমি অনেক পালটে গিয়েছ।"

বিছানায় বসল নীলিমা। "পালটাব না কেন? কচি খুকি আর নয়। বয়েস হয়ে গিয়েছে। তোমার সমান সমান।"

বোধন মুখ ভরতি করে সিগারেটের ধোঁয়া নিল। গিলে ফেল সবটাই। আলুর চপের ঝাল, চায়ের তেঁতো স্বাদ সব মিলেমি গলা-জিব কেমন লাগছিল। দেখছিল নীলিমাকে। টান করে বাঁ চুল, বড় বড় চোখ, গলার তলায় কি শ্বেতী ফুটছে। গায়ের আঁচ আলগা। শুধুই জামা পরে আছে নীলিমা, নীচে বোধ হয় কি নেই। আঁটো, ছোট বুক। নীলিমার ওই রকমই বরাবর। যা বাড় বলে নীলিমার কখনোই তেমন বাড়ন্ত গড়ন হল না। তবু চাকরি করে, খাটে, উপার্জনের পয়সায় পেট ভরায়।

"কে না পালটায় গো," নীলিমা বলল, "তোমরা পালটাও নি ?"

বোধন জবাব দিল না। দেবার দরকার করে না। তারা পালটেছে। বাবা, মা, চুয়া—সবাই। হঠাৎ কেমন রাগ হল বোধনের বলল, "তুমি আর কি নেশা করো ?"

নীলিমা চোখে চোখে তাকিয়ে কেমন যেন বেঁকা করে হাস ঠোঁটে। "মদের কথা বলছ? আমাদের কেউ কেউ খায়। দু দ ফোঁটা মদে আর কি হবে। আমিও খেয়েছি। ঘরেই থাকে, জামাই বাবুর কাছে।"

বোধন বলল, "দারুণ।" গলার মধ্যে বিদ্রূপ ছিল। "আর কি করো না ?"

দেখছিল নীলিমা বোধনকে। মুহূর্ত কয় চুপ করে থেকে বলল

আরও অনেক কিছু করি। করতে হয়। খারাপ কি। গা বাঁচিয়ে লেলে আমাদের চলে না। তোমাদের ভদ্র সংসারের কত রকম দখতে হয়…।"

"শুনি?"

"কী?"

"একটা দেখার গল্প বলো, শুনি।"

"কেচ্ছা শুনতে চাইছ।" বলল নীলিমা। অন্যমনস্ক হল সামান্য। কী হবে শুনে!" নীলিমা ভাবছিল কিছু। হঠাৎ বলল, "শুনবে? কটা অন্য ঘটনা বলছি শোনো, কেচ্ছার নয়। আমি হাসপাতালের করি ছাড়াও মাঝে মাঝে নার্সিং হোমে গিয়ে কাজ করে আসি। াড়তি কিছু টাকা হাতে আসে। টাকার কার না দরকার, বলো। পাড়ার কাছাকাছি এক নার্সিং হোমে আমি মাঝে মাঝে ঠিকে াজ নি। একবার দিন সাতেকের কাজ নিয়েছিলাম। এক ভদ্র-হিলার মেয়েলী বড় অপারেশান। সেখানে একদিন রাত দশ সোয়া শটা নাগাদ একটা কাণ্ড ঘটল।"

বোধন সিগারেট খাচ্ছিল অলসভাবে। নীলিমা দু হাত বিছানার পাশে দিয়ে ঝুঁকে বসে আছে। সিগারেট শেষ।

"কতকগুলো ছেলে—জনা চার পাঁচ হুড়মুড় ক'রে দোতলায় উঠে এল। ডাক্তারবাবুকে খুঁজছে। ওদের সঙ্গে আর একজন। তার মুখের ওপর একটা ছেড়াফাটা জামা জড়ানো, হাতে ফেট্টি। সে চিৎকার করে কাঁদতে চাইছে যন্ত্রণায়, পারছে না। বন্ধুরা তাকে ধমকাচ্ছে, বারণ করছে। অত রাত্রে নার্সিং হোমে ডাক্তার কোথায় পাবে। দরকার ছাড়া কেউ আসে না। ইনচার্জের সঙ্গে কী কথা হল জানি না—আমাদের কেবিনের পাশে ছেলেটাকে রেখে তার বন্ধুরা চলে গেল। তারপর সারা রাত সে কি চিৎকার আর কান্না, একটা গরু মোষ

কাটলে যেমন চেঁচায় জন্তুটা সেইরকম। ইনজেকশন দিয়েও তা
ঘুম পাড়ানো যায় না। তার কি হয়েছিল জান? পুলিস মার
বোমা বাঁধছিল, ফেটে গিয়ে নাক মুখ ঝলসে পুড়ে গিয়েছে, চো
অন্ধ। কিছু দেখতে পাচ্ছিল না বেচারী। বুঝতে পারছিল তার চো
অন্ধ হয়ে গিয়েছে। কাঁদছিল, চেঁচাচ্ছিল। আর তার বন্ধুরা লুকি
লুকিয়ে এসে তাকে বলে যাচ্ছিল—তুই ভাবিস না, আমরা অন্য ব্যব
করছি। কোনো রকমে সহ্য কর। চেঁচামেচি করিস না। পুলিস
করে ফেলবে। তুই একটু সহ্য কর, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

বোধন নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনছিল।

"ছেলেটা যতক্ষণ হুঁশে থাকত, আমার চোখ, আমার চোখ
কী হল আমার, কেন আমি দেখতে পাচ্ছি না—করে চেঁচাত আ
কাঁদত। ছেলেটা দুদিন ওইভাবে পড়ে পড়ে কাঁদল। তারপর একদি
রাত্তিরে এসে তার বন্ধুরা ওকে নিয়ে গেল।"

"কী হল তারপর?"

"তা জানি না। তবে পরের দিন ভোরে পাঞ্জাবী হোটেলের কা
রাস্তায় একটা ছেলেকে গুলি খেয়ে মরে পড়ে থাকতে দেখ
গিয়েছিল।"

বোধন আঁতকে উঠে শব্দ করল : নোটন। তাদের পাড়ার নোটন
নোটন পাঞ্জাবী হোটেলের সামনে মরে পড়েছিল বলে সে শুনেছে
"নোটন?"

নীলিমা কোন জবাব দিল না।

একেবারে চুপচাপ? কিছুক্ষণ পরে বোধন বলল. "নোটনকে তা
দলের বন্ধুরাই মেরেছিল বলে শুনেছি। ধরা পড়ার ভয়ে।"

নীলিমা চুপচাপ।

বোধনের মনে হল, সে অনেকক্ষণ বসে আছে। কটা বাজল কে

ানে। "কটা বাজল বলতে পার?"

"সোয়া আট, সাড়ে আট হবে। ঘড়ি দেখে বলব?"

"না, থাক। আমি এবার উঠি।"

"উঠবে?"

"শীতকাল। রাত হচ্ছে।"

"তাহলে এসো।"

বোধন উঠে দাঁড়াল। "তোমার আর একটা সিগারেট নেব?"

"নাও না।"

বোধন সিগারেট নিল; ধরাল না! পরে রাস্তায় ধরাবে।

দরজার কাছে এসে নীলিমা বলল, "ও একটা কথা তোমায় বলতে ...লে গিয়েছি। শোভনাদিকে সেদিন দেখলাম।"

"দিদিকে? কোথায়?"

"আমাদের হাসপাতালে এসেছিল।"

"হাসপাতালে? কেন?"

নীলিমা হাসির মুখ করল। "তুমি বুঝতে পারবে না। দায়ে পড়ে ...সেছিল। মাস খানেকের প্রেগনেন্সি নিয়ে। আজকাল এক রকম ...ন্ত্র বেরিয়েছে। প্রথম দিকে এলে ওতে বেশি সময় লাগে না। ঘণ্টা ...নেক পরেই ছাড়া পেল। ট্যাক্সি করে চলে গেল! সঙ্গে লোক ...ল।"

"বঙ্কিনাথ?"

"না বঙ্কিনাথ নয়। অবাঙালী একজন। তা খুব যত্ন করে নিয়ে ...গল।"

দরজার মুখে দাঁড়িয়ে বোধন নীলিমার মুখ দেখল। হাত পা ...াঠ। বোধন সবই বুঝতে পারছিল।

বারো

কলকাতায় এমন হাড়-জমানো শীত পড়বে ভাবাই যায় নি। হুট করে চলে এল। কাগজে বলছে, উত্তরে বরফ পড়ছে, শীতের ঝাপটা চলছে দিল্লিতে, আগ্রায় ; পাটনাতেই এক দিনে তিন জন মা... গিয়েছে।

স্বকুমার অঘটনের খবর পড়তে ভালবাসে। সে এই সব পড়ছি... আর বোধনকে বলছিল। বোধন বসে বসে একটা চিঠি তৈরি কর... স্বকুমারের জন্যে। স্বকুমার তার দোকান বাড়াবার জন্যে হন্যে হ... উঠেছে। ব্যাংকের একজন বলেছে, টাকা ধার পাইয়ে দে... স্বকুমারকে। সেই টাকার আশায় এই চিঠি। স্বকুমারের কথা ম... বোধন বাবার কাছ থেকে জেনে এসেছে, কী লিখতে হবে, কে... করে লিখতে হবে চিঠিটা। চিঠি কালই স্বকুমার ব্যাংকে নি... যাবে। আগে চিঠি, তারপর না অন্য কাজ।

দোকানে বসেই চিঠি লেখা হচ্ছিল। এখন ক'দিন আলো থাক... সন্ধেবেলায়। আজ এখন অন্তত আছে, হুস করে চলে যেতে পারে।

বোধন চিঠি লেখা প্রায় শেষ করে এনেছিল। স্বকুমার চুপচা... বসে না থেকে সকালের বাসী কাগজটাই রেডিয়োর খবর পড়ার মত... করে পড়ছিল।

শীতের জন্যে রাস্তায় লোকজন কম কম লাগছে। তবু আসা... যাওয়া রয়েছে, ট্যাক্সি ঢুকছে, রিক্‌শা যাচ্ছে, একটা লরিও ঝর...

়তে করতে চলে গেল।

স্নকুমার বলল, "বোধ্না, আর একবার চা হোক—কি বলিস?"
মারের মেজাজ খুশী থাকলে সে বোধনকে আদর করে বোধ্না
।

বোধনের শীত করছিল। জামার তলায় গেঞ্জি নেই, পুরোনো
-কাটা এক সোয়েটার, তার ওপর জামা। জামার ওপর স্নতীর
দর। মেয়েলী চাদর। মার। পা দুটো কনকন করছে।

"বলো," বোধন বলল।

দোকানে কেউ নেই। স্নকুমার উঠে পড়ে চা বলতে গেল।

বোধন চিঠি শেষ করতে লাগল। বাবাকে একবার দেখিয়ে নিতে
ব! ভুলভাল কি লিখছে সে জানে না।

স্নকুমার ফিরে এল। "নে কেক্ খা।"

"কেক?"

"বছরের শেষ দিন। খেয়ে নে। পরিমলের দোকানে একটাই
ড়ছিল। নিয়ে নিলাম।" স্নকুমার আধখানা কেক বোধনের
মনে রাখল।

চিঠি শেষ করল বোধন। মাথা তুলল। "শুনবে কি লিখলাম?"

"পড়। ইংলিশ ব্যাপার, বুঝিয়ে দিবি।"

"বাবাকে একবার দেখিয়ে নেব।"

"তা হলে আর আমায় শোনাচ্ছিস কেন? মেসোমশাই দেখে
লেই ফাইন্যাল।"

"তবু একবার শোনো। তোমার জিনিস।"

"পড় তবে।"

চিঠি পড়ার মধ্যে দোকান থেকে কাচের গ্লাসে চা এল।

বোধন চিঠি শেষ করে বলল, "ঠিক আছে?"

"ফার্স্ট ক্লাস। মেসোমশাইকে দেখিয়ে নিবি।...নে, চা খা।"

সুকুমারের মন-মেজাজ আজ ক'দিন ধরেই ভাল। মা বর্ধমা গিয়ে শান্তিতে আছে। বাড়িতে বউ আর ওরকম কানের কা গজগজ করছে না। তার ওপর সুকুমার ধরেই নিয়েছে, ব্যাং টাকা সে পাবেই, পেলেই দোকানটা আরও বাড়াবে, গুছিয়ে নে মালপত্র রাখবে ইলেকট্রিকের, রেডিয়ো সারাইয়ের ব্যবস্থা করে এ-সব দিয়ে দোকান বাড়ালে সেটা চলবেই। দেখতে দেখতে পাড়া কেমন জমজমা হয়ে গেল।

কেক চা খেতে খেতে বোধন বলল, "তোমার সঙ্গে বলাইবা কথা হল?"

তাকাল সুকুমার বোধনের দিকে। "আজই হয়েছে।"

"কী বলছে?"

"বলছে, অফিসের গণ্ডগোলটা না মিটলে কিছু করতে পারছে না

"গৌরাঙ্গ অন্য কথা বলছে!"

"কী বলছে গোরা?"

"বলাইবাবুর পার্টনার বাগড়া দিচ্ছে।"

সুকুমার জবাব দিল না। ব্যাপারটা অন্যরকম। গোরা বোধনকে নিয়ে বলাইবাবুর কাছে গিয়েছিল। কথাবার্তাও বলেছে বলাইবাবু বোধনের সঙ্গে। কিন্তু অন্য জায়গায় আটকে গিয়েছে সুকুমার বোধনের জন্যে তদ্বির করতে গিয়ে প্রথম দিন কিছু শোনে দ্বিতীয় বার যাবার পর বলাইবাবু বললেন, 'তোমায় আসল কথা বলি সুকুমার লিক করে দিও না। আমার লোক চাই নিশ্চয়, কি তাকে ক্যাশ হ্যাণ্ডেল করতে হবে। যে ছিল সে আমাদের ডুবিয়েছে ক্যাশের ব্যাপার—বুঝতেই পারছ, দশ বিশ টাকা সরিয়ে নিলে ধরা যাবে না। রিলায়েবল লোক হওয়া দরকার। বোধনে

ফ্যামিলির যা অবস্থা শুনলাম তাতে ভরসা হচ্ছে না। অভাবে স্বভাব নষ্ট বলে যে কথা আছে—উড়িয়ে দেওয়া যায় না একেবারে। তার ওপর আমি ওর বাবা সম্পর্কেও একটু খোঁজ নিলাম। লাকিলি আমার পুরোনো এক বন্ধু ওই ব্যাংকে কাজ করেছে। সে বলল, ভদ্রলোক ব্যাংকের লোন সেকশানে কাজ করতেন। টাকা পয়সা খেতেন। আরও সব কি ব্যাপার! হি ওয়াজ সাসপেণ্ডেড। কেস হয়। ভদ্রলোকের চাকরি যায়। এই ধরনের বাড়ির ছেলেকে ক্যাশে আনা ...বুঝতেই পারছ, সাহস হচ্ছে না। আমার পার্টনার একেবারে এগেনস্টে। তবু পাড়ার ছেলে বলে আমি চেষ্টা করছি। তুমি কিছু বলো না। বেচারীর মন খারাপ হবে।'

সুকুমার চটে গিয়েছিল। সামলে বলল, "কাকাবাবু, বোধন খুব ভাল ছেলে। সে চুরিচামারি করার ছেলেই নয়। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করুন। পাড়ার যে কোনো লোককে ওর স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন।"

বলাইবাবু শান্ত নম্র গলায় বললেন, "আমি জানি সুকুমার। গৌরাঙ্গ ওকে এনেছে, তুমি বলছ—তার ওপর কথা থাকতে পারে না। বাপের দোষ ছেলেতে বর্তাবে যে তারও কোনো মানে নেই। কিন্তু আমার পার্টনার বেশী খুঁতখুঁতে। আমি চেষ্টা করছি। তুমি ওকে কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলো। পাড়ার ছেলে আমার বিবেকে লাগছে। আমি ওকে অন্য কোনো ভাবে নেবার চেষ্টা করব।"

সুকুমার আর কিছু বলে নি। মনে মনে বলেছিল—শালার বিবেক! বেয়াইয়ের পোঁদে তাপ্পি মেরে গাড়ি কিনেছে, শাহেন সা পার্টি।

বোধনকে এ-সব কথা বলা যায় না। বলেও নি সুকুমার। কথা

এড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মেসোমশাইয়ের ব্যাপারটা শুনে তার খারাপ
লেগেছে। অবশ্য বাপ হলেই কি সে ঠাকুর দেবতা হয়ে ওঠে
সুকুমারের বাবাই বা এমন কি গঙ্গাজল ছিল! এ-পাড়ায় কত চিটিং
বাজ, ঘুষ খাওয়া, মালটানা বাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সুকুমার কথা ঘোরাল। "নে সিগারেট খা। বলাইবাবু চেষ্ট
করছেন।"

বোধন কেক শেষ করেছিল। চা খেতে লাগল।

"আমার কিছু হবে না, সুকুমারদা?"

"হবে রে বেটা, হবে। না হয়ে যাবে কোথায়? আমার হয়েছিল
বাবা ফট্ হয়ে যাবার পর কি লাথিঝেঁটা খেয়েছি রে, বোধন। কুকুর
বেড়ালের মতন পাছায় লাথি খেতাম। এখন দেখ্। নিজের পেট
চালাবার জন্যে কার কাছে হাত পাতি? তোরও হবে আর আমার
টাকা এলেই তো রেডিও ডিপার্টমেণ্ট করছি তোর জন্যে। নে
সিগারেট খা।"

বোধন সিগারেট নিল। ধরাল।

"ছক্কু বলছিল," বোধন বলল, "ও যে মিনিবাসে খাটে সেখানে
আমি খাটতে পারি।"

"মিনিবাস? কার মিনিবাস?"

"মালিকের নাম জানি না। নাগের বাজারে থাকে।"

"ছক্কু কোন রুটে খাটে?"

"ডানলপ ব্রিজ।"

"কত কামায়?"

"গোটা হপ্তা খাটতে পারে না। পাঁচদিন খাটে। শ' তিনেক
পায়।"

"ও তুই পারবি না।" সুকুমার পা তুলে দিল টেবিলের ওপর

"ছক্কু পারে।"

"এ তুমি কি কথা বলছ? ছক্কু বি কম পাস।"

"এ কম বি কম-এ কিছু না। ছক্কুর চেহারা দেখেছিস! ও খাটতে পারে, ঝগড়া করতে পারে, আর বানচোত বলে হাত গুটোতে পারে। তুই পারবি না।"

"কেন?"

"কে-ন?" সুকুমার এমনভাবে বলল, যেন এই সহজ কথাটা বোধনের মাথায় ঢুকছে না কেন। "কেন বুঝছিস না? মালিকের খেচামেচি তোর সহ্য হবে না। প্যাসেঞ্জাররা তো শালা মাল, এ বলবে ধীরে চলো ও বলবে জোরে চলো, বাসে উঠেই দশ টাকার নোট ভেড়াবে লাটের মতন, পচা নোট চালাবে। তারপর আজ পুলিসের গুঁতো, কাল প্যাসেঞ্জারের গুঁতো। টায়ার পাঞ্চার হল তো জ্যাক মারো।...তুই এ-সব পারবি না। তার ওপর যাদের পাল্লায় পড়বি আরা বেশীর ভাগ অ্যায়সা খিস্তি খেউড় করবে তোর যেটা শুনে কান লাল হয়ে উঠবে।"

বোধন রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বলল, "আমি যদি কিছুই না পারি বাঁচব কেন?"

সুকুমার তাকাল। তাকিয়ে থাকল বোধনের দিকে। তার বড় কষ্ট হচ্ছিল। কেন যে এই ছেলেটাকে এত ভালবাসে! কে জানে! ভালবাসে, বিশ্বাস করে, প্রশংসা করে।...কত বছর আগেকার কথা, সুকুমাররা যখন বাগবাজারে থাকত, সুকুমারের বারো তেরো বয়েস তখন তার ছোট ভাই বিশু বর্ধমানের দেশের বাড়িতে পুকুরে ডুবে মারা যায়। সুকুমারেরা তখন মাঝে মাঝে দেশের বাড়িতে যেত। বোধনের সঙ্গে সেই ভাইয়ের কোনো মিল নেই। শুধু চোখ দুটোয় যেন ভীষণ মিল।

কথাটা সুকুমারের মনে হয়, কিন্তু কাউকে বলে না, মাকে নয়, বউকে নয়, বোধনকেও না। বলে না এই জন্যে যে, সেই ছোট ভাই—বিশু—পুকুরে ডুবে মরে যাবার একটা কারণ সুকুমার। যদি সুকুমার সাত আট বছরের ভাইকে বর্ষার ভরা পুকুরে সাঁতার শেখাবার বাহাদুরী না করত বিশু ডুবত না। এই আফশোস, দুঃখ, পাপ সুকুমার এখনও যেন বয়ে বেড়াচ্ছে।

মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল বলে সুকুমার উঠে পড়ল। "নে নে ওঠ, দোকান বন্ধ করি।"

বোধন কয়েক মুহূর্ত বসে থেকে উঠল।

"চিঠিটা নিলি?"

"নিয়েছি।"

"মেসোমশাইকে ভাল করে দেখে নিতে বলবি।"

বোধন কথা বলল না।

সুকুমার দোকান বন্ধ করতে লাগল। বোধন হাত লাগাল।

দোকানে গোটাতিনেক তালা মারল সুকুমার। "জগৎ কাল আসবে। জ্বর ছেড়ে গিয়েছে।"

রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেঁপে উঠল বোধন। বড় শীত করছে। বাতাসটাও হাড়ে গিয়ে লাগে।

"নে চল," সুকুমার পা বাড়াল।

চুপচাপ খানিকটা হেঁটে এসে সুকুমার হঠাৎ বলল, "তুই একটা সিসের আংটি পর তো।"

"কেন? সিসের আংটি পরব কেন?"

"পর। তোর মাথা ভাল থাকবে।" বলে সুকুমার হাসবার চেষ্টা করল, হাসিটা ঠিক গলায় এল না।

তেরো

বিনুর গলা বসে গিয়েছিল। অনবরত মুখ তুলে কাশছে। এক হাতে রুমাল, অন্য হাতে কফ লজেন্স। বলল, "আমি মরে গিয়েছি।" বলে অস্থিরভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে ঝপ করে বসে পড়ল।

"জ্বর ?" বোধন জিজ্ঞেস করল।

"জ্বর না গলা—টনসিল। কথা শুনছ না—? ঘ্যাসঘ্যাস করছে।"

বোধন হাসল। বিনুর গলা বসে যাওয়া মানে আজ আর বই খোলাও হবে না। অন্য দিন তবু সামনে বই থাকে, হাতে কলম পেন্সিল। আজ তাও নয়।

"হাসছ কেন ?" বিনু বলল।

"না, আজ একেবারে ছুটি কিনা তাই—," বোধন মজা করে বলল।

"কাল আমরা পিকনিকে গিয়েছিলাম। কাকাদের অফিসের বন্ধুরা, উইথ ফ্যামিলি। মা যায় নি, আমি গিয়েছিলাম। সারাদিন গঙ্গার কনকনে হাওয়া খেয়ে এই অবস্থা…।"

বোধন বুঝতেই পারছিল। পিকনিকের কথা বিনু আগেই বলেছিল, তবে সে যাবে কি যাবে-না তখনও ঠিক করে নি। নতুন বছর পড়ে গিয়েছে, শীতের দিন—এখন তো এ-সব হবেই।

"আমি আর তাহলে কী করব ! পালাই ?" বোধন বলল।

"পালাবে কেন, বসো।" বিনু মুখ তুলে আবার কাশল। গলা

পরিষ্কারের চেষ্টা করল। করেই লজেন্স মুখে দিল।

"মাসীমা কোথায় ?" বোধন জিগেস করল।

"ঘরে। আসছে।...কাল তুমি আস নি তো ?"

"না। কেন ?"

"কাল তোমাদের পাড়ায় দুটো ছেলে এসে তোমার নাম বলে মার কাছ থেকে পাঁচটা টাকা নিয়ে গেছে। বলেছে কিসের যাত্রাফাত্রা করবে।"

"আমি কাউকে পাঠাই নি। যাত্রার ব্যাপারও জানি না। আচ্ছা তো !"

"মা সেটা বুঝতে পেরেছে।...তোমাদের পাড়ায় কতগুলো বাজে ছেলে থাকে।...সব পাড়াতেই থাকে। এ-পাড়ার বাজে ছেলেগুলো একেবারে বাজের বাজে।"

বোধন হেসে ফেলল।

বিনুর মার সাড়া পাওয়া গেল। "বিনু, বোধন এসেছে ?"

"হ্যাঁ।"

"আসছি।"

বিনুকে আগের চেয়ে আজকাল সামান্য ভাল দেখায়। উনিশ বিশ। বাড়িতে এখন তার খুব যত্ন। বোধন ঠিক জানে না, বিনুর মুখেই শুনেছে—গত বছর তার প্লুরিসির মতন হয়েছিল, সেরে গিয়েছে —তবু এখনও ঠাণ্ডা লাগানো, ভারী কাজকর্ম করা বারণ। বিনু কিছুই করে না, হয়ত নিজের বিছানাটা পরিষ্কার করল, চা করল কিংবা ওমলেট ভাজল একটা। এমন আরামে থেকেও কেমন করে অসুখ করে মানুষের কে জানে! বিনুর কোনো অভাব নেই। না থেকেও এই শরীর স্বাস্থ্য ! আশ্চর্য।

বিনুর মা ঘরে এলেন। গায়ে চাদর। পাতলা। কালো রঙ।

মাথার খোঁপা সামান্য ওঠানো। চশমা চোখে নেই। "তুমি কাল এলে না কেন?"

"কাল? কাল তো আমার"...বোধন অবাক হচ্ছিল।

"সুকুমার তোমায় কিছু ব'লে নি?"

"কই না।"

"আমি যে ওকে বললাম, তোমায় একবার পাঠিয়ে দিতে। বেলার দিকে ও সামনের বাড়িতে এসেছিল। দেখতে পেয়ে বললাম।"

বোধন বুঝতে পারল। কাল বোধন সুকুমারদার দোকানে যায় নি। দেখাও হয় নি। বোধন কাল সারা দুপুর, বিকেলে পাড়াতে ছিল না। গৌরাঙ্গর সঙ্গে ইডেন গার্ডেনসে রঞ্জি ট্রফির খেলা দেখতে গিয়েছিল। গৌরাঙ্গই টেনে নিয়ে গিয়েছিল। গৌরাঙ্গ বেলগাছিয়ার ক্রিকেট টিমে খেলে। বোধনও একসময় পাড়ার ক্লাবে খেলত। কাল নিতান্ত শীতের দুপুর কাটাবার জন্যে, রোদ খাবার জন্যে বোধন মাঠে গিয়েছিল। ফিরেছে সন্ধে নাগাদ। বাড়ি ফিরে আর কোথাও বেরোয় নি।

"আমার সঙ্গে সুকুমারদার দেখা হয় নি," বোধন বলল। "কোনো দরকার ছিল?"

"ছিল।...তুমি একটু বসো। আমি হাতের কাজ সেরে আসছি।"

অনুপমা চলে গেলেন। বোধন বিনুর দিকে তাকাল, যেন জানতে চাইল, কাজটা কী?

বিনু হাতের রুমাল নিয়ে খেলা করছিল। কেমন যেন গন্ধ এল বাতাসে। বোধন বলল, "কী লাগিয়েছ?"

"ইউকেলিপটাস। বেশী পড়ে গিয়েছে।"

"তোমার ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা।" বোধন হাসল, "অত ইউকেলিপটাসে মাথা ধরে যাবে।"

"যাক গে, আমারই তো মাথা।" বলে বিন্নু নিজের মাথায় কিল মারল ছেলেমানুষের মতন।

বোধন হাসল। কিছু বলল না। বিন্নু অদ্ভুত। এই মেয়ের যে কেমন করে বিয়ে হবে কে জানে! যে-বিয়ে করবে তারই মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

"হাসছ যে?" বিন্নু বোধনের হাসি থেকে কিছু অনুমান করে বলল।

"এমনি।"

"এমনি আবার কেউ হাসে নাকি। তোমার মুখ থেকে গন্ধ কিছু মালুম হচ্ছে।"

বোধন নিজেও মজা পেতে চাইছিল। কথাটা বলতে ইচ্ছে করছিল তার। বলবে? দরজার দিকে তাকাল। বিন্নুর মা কি কাছাকাছি আছেন? না বোধ হয়। গলা নামিয়ে বোধন বলল, "মাথা খারাপদের বিয়ে হয় কেমন করে?" মজার মুখে হাসছিল।

বিন্নু টেরা-টেরা চোখ করে চটপট জবাব দিল, "রাজুরও তো মাথা খারাপ। আমার চেয়েও বেশি।"

"তুই মাথাখারাপে তাহলে ভয়ংকর কাণ্ড হবে যে।" বোধন হাসছিল।

"কাটাকাটি হয়ে যাবে। এ একেবারে মেথামেটিকস।"

বোধন জোরে হেসে উঠল। বিন্নুও হাসছিল।

তু জনের হাসাহাসির মধ্যে অনুপমা ঘরে এলেন। দেখলেন তুজনকে। "এত হাসির কি হল?"

বিন্নু বলল, "মাথাখারাপের কথা হচ্ছিল। বোধনদা আমায় পাগল বলছে।"

বোধন অপ্রস্তুত। "না না, পাগল কোথায় বললাম—!"

"বলেছ বেশ করেছ," অনুপমা বললেন, "পাগল ছাড়া আবার কি!" বলে মেয়ের দিকে তাকালেন আবার, "চা ভিজিয়ে দিয়ে এসেছি, ঢেলে নিয়ে আসবি? বোধনের জন্যে দুটো পাঁপর ভেজে আনিস।"

বিনু আড়চোখে বোধনকে দেখল। তার চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, সে সবই বুঝতে পারছে। মা তাকে সরিয়ে দিচ্ছে ঘর থেকে।

বিনু উঠে গেল।

অনুপমা বসলেন। "কাল তোমার জন্যে হাঁ করে বসে থাকলাম। দরকারী কথা ছিল।"

বোধন বলল, "আমি খবর পাই নি।"

"তাই তো শুনছি।" অনুপমা সামান্য চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, "বিনুর তো বিয়ে।"

বোধন অবাক হবার ভান করল। বিনুর মুখে কী শুনেছে সে সেটা জানতে দেওয়া উচিত নয়। কী মনে করবেন বিনুর মা! "বিয়ে?"

"এই মাঘ মাসের শেষে।

বোধন যেন কতই বোঝে মাথা চুলকে বলল, "বিনু তো ছেলেমানুষ, মাসীমা। কম বয়েস।"

"একেবারে কম কোথায়, কুড়ি পেরিয়ে গিয়েছে।" একটু থেমে আবার, "আজকালকার হিসেবে একটু কম। আমাদের সময়ে এই রকমই হত। আমারও উনিশ শেষ হতে বিয়ে হয়েছিল। বিনু হয়েছে অনেক পরে, বছর তিন চার।"

বোধন মার কথা ভাবল। মারও কুড়ি বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। মার প্রথম সন্তান দিদি। তারপর বোধন।

"আমার তো ওই একটি মেয়ে," অনুপমা বললেন, "ছেড়ে থাকতে কি ইচ্ছে হয়। কিন্তু কি করব বলো, বিয়ে তো দিতেই হবে রোগা-

সোগা মেয়ে, রোজ শরীর খারাপ, অসুখ। আর নিজেই দেখেছ, লেখাপড়ায় ওর মন নেই। বাড়িতে বসে পড়াশোনা করবে তাও করবে না। ওকে নিয়ে আমার বড় ভাবনা। বরাবর। বিনুর বাব চলে যাবার পর থেকে ওই মেয়ে নিয়ে আমার কেটেছে। ছেলে-মেয়ের দায় বড় দায়, বোধন। সে তুমি এখন বুঝবে না। ছেলেমানুষ পরে বুঝবে।"

বোধন যেন কিছুই জানে না, বলল "কলকাতার ছেলে?"

"না। দিল্লির। আমাদের চেনাশোনা। বিনুর বাবারই এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের ছেলে। বন্ধুর ছেলেও বলতে পার। ছেলেটি ভাল। বিনুকে বাচ্চা বয়েস থেকে দেখেছে। দুজনে ভাব-সাব ছিল বরাবরই।"

"ও। আচ্ছা।"

"ছেলের, তরফ থেকেই তাড়া বেশি। ছেলের বাবার শরীর ভাল যাচ্ছে না। তিনি ব্যাপারটা ফেলে রাখতে চান না।"

বোধন মাথা নাড়ল। যেন সবই বুঝতে পারছে।

অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে অনুপমা বললেন, "তোমায় কটা কাজ করে দিতে হবে।"

"বলুন?"

"বিনুর কাকাকে দিয়ে কোনো কাজ হয় না। ভরসাও করা যায় না। অফিস আর অফিস থেকে বেরিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ক্লাবে বসে তাস খেলা। কিছু বোঝে না। এক বললে আরেক করে বসবে। আমি সুকুমারকে বলেছি। আমায় একটা বাড়ি যোগাড় করে দিতে হবে, অন্তত চার পাঁচ দিনের জন্যে। দিল্লি থেকে ছেলের বাড়ির ছ সাত জন থাকবে এসে। তারপর ধরো বিয়ে-থার ব্যাপার। প্যাণ্ডেল. আলো, খাওয়া-দাওয়া বাজার ছোটাছুটি…। আমার তো সহায়

বলতে কিছু নেই। তোমাকেই বলতে পারি! আর সুকুমার।"

বোধন শুনল সব। বলল, "আপনি ভাবছেন কেন। সুকুমারদাকে বলেছেন তো, সব হয়ে যাবে, আর আমি তো আছি।"

অনুপমা যেন খুশী হলেন। আবার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, বিনু এল। পাঁপর ভাজা চা রাখল।

মেয়েকে দেখে অনুপমা যেন অস্বস্তি বোধ করলেন। আরও কিছু বলার আছে। বললেন, "তোর কাকার খাবারটা করে রাখ না। আসার তো সময় হল।"

বিনু চলে যেতে যেতে বলল, "বোধনদা, যাবার আগে বলবে আমার দরকার আছে।"

"নাও, চা খাও," অনুপমা বললেন।

বোধন পাঁপর ভাজা খেতে লাগল।

অন্যমনস্ক হয়ে অল্পক্ষণ বসে থাকলেন অনুপমা, তারপর বললেন, "আর একটা কথা আছে, তুমি কাউকে বলবে না।"

তাকাল বোধন। অবাক হচ্ছিল।

"বলবে না?"

ইতস্তত করে বোধন বলল, "না।"

"আমার কিছু সোনাদানা আছে। বিনুর জন্যে ভেঙেচুরে গড়তে দিয়েছি।...আর কিছু আছে যা আমি বেচতে চাই।" গলার স্বর একেবারে নেমে গেল অনুপমার। "তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি দোকানে যাব। একা যেতে পারি না। যাওয়া উচিত নয়।"

বোধন আশ্চর্য হয়ে গেল। সোনা বেচতে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চান বিনুর মা। বোধন সোনাই চেনে না। তাদের বাড়িতে সোনা বলতে মার কানে কি একটা আছে একরত্তি, আর হাতের লোহাটা। মা সেই কবে কার সোনা দিয়ে বাঁধানো লোহাটা এখনও

পরে আছে।

বোধন বলল, "আমি তো সোনার দোকান চিনি না।"

"দোকান আমি চিনি।...আমার চেনা দোকান।"

"তা কাকাবাবু তো আছেন—তিনি আপনার সঙ্গে..."

"না," অনুপমা মুখের কাছে আঙুল তুললেন, গলা আরও নামল, "বিনুর কাকাকে কিছু জানাতে চাই না বলেই তোমায় বলছি। সে যেন কোনোদিন কিছু জানতে না পারে।"

বোধন বোবা। কিছু বুঝছিল না। বিনুর মার চোখ সতর্ক। বোধনের দিকে তাকিয়ে আছেন।

"বেশ, যাব।"

অনুপমা নিঃশ্বাস ফেললেন, "আমি তোমায় পরে জানাব।"

কথা ঘুরিয়ে নিলেন অনুপমা, অন্য কথা তুললেন। দু চারটে এলোমেলো কথা বলে উঠলেন।

বোধনের চা খাওয়া শেষ হয়েছিল।

"বিনুকে ডেকে দি, তোমার সঙ্গে কি দরকার বলল...।"

অনুপমা চলে গেলেন।

বোধন বিনুর মা আর বিনুর কাকার কথা ভাবছিল। আশ্চর্য। সবই কেমন অদ্ভুত।

বিনু এলো। "উঠবে?"

"হ্যাঁ।"

"চলো তবে।"

সদরে এসে বিনুই দরজা খুলল। বাইরে এল। বোধনও বাইরে এসে দাঁড়াল। শীতের হাওয়া দিচ্ছে কনকনে। চারপাশে কুয়াশার মতন! ট্রেন যাচ্ছে অনেকটা তফাত থেকে, ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের হুইসল বাজছিল।

বিন্নু বলল, “মা আমার বিয়ের কথা বলছিল না ?”

“হ্যাঁ।”

“আর কি বলল ?”

“আবার কি ! ওই কথাই বলছিলেন।”

বিন্নু বোধনের বুকের কাছে আঙুল দিয়ে খোঁচা মারল। “আজ তোমায় একটা কথা বললাম না। আর ক’দিন যাক, বলব। বাইরে থেকে সব জিনিস দেখো না।”

বিন্নু সদরের দিকে মুখ ঘোরাল আবার।

সুকুমারের দোকান থেকে ঘুরে বোধন বাড়ি ফিরছিল। রাত বেশি নয়। আটটা হবে। জোর শীত পড়েছে। আকাশের তলায় কুয়াশা যেন জমাট বাঁধছে। উত্তরের বাতাস দিচ্ছিল। এই ঠাণ্ডায় ঘোরাঘুরি না করে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরছিল বোধন। সুকুমারদার সঙ্গে কথা হয়েছে। বাড়ির খোঁজ পাওয়া যাবে কাল পরশু, প্যাণ্ডেল বাঁধার জন্যে ঘনশ্যামকে বিন্নুদের বাড়ি নিয়ে গেলেই হবে, ইলেকট্রিকের জন্যে সুকুমারদাই রয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা বিন্নুর কাকা দেখবেন। ক্যাটারিং। মোটামুটি এই। কিছুই আটকাবে না। বাকী কাজ যেটা—সেটা নিয়ে সুকুমারদার সঙ্গে কথা বলার উপায় নেই। কিন্তু বোধন কিছুতেই বুঝতে পারছে না, বিন্নুর মা কেন সোনা-দানা বেচতে চান ? নিশ্চয় টাকার জন্যে। বিয়ের খরচ মেটাবেন বিন্নুর মা। বিন্নুর কাকা তাহলে আছেন কেন ? তার চেয়েও বড় কথা বিন্নুর মা বিন্নুর কাকাকে লুকিয়ে এ-কাজ কেন করতে চান ? দুজনের মধ্যে কিসের একটা ব্যাপার আছে। বোধন এতদিনে অনেকটা ধরতে পেরে গেছে ওঁদের সম্পর্কটা। সোজা, সরল, স্বাভাবিক নয়।

তা থাকগে। বোধনের কি ? এ-রকম আজকাল খুব চলে। সিন্নকের প্রতিভা বউদিরও এইরকম। দুই মেয়ে নিয়ে থাকে, বারো চোদ্দ

বয়েস, স্বামী আছে কোথাও, আসে না, যে-আসে সে অন্য লোক—
—প্রতিভা বউদির এক মাসতুতো ভাই, সিনেমার ক্যামেরাম্যান।
আরও আছে। এই পাড়াতেই।

বিন্নুর বিয়েটা তাহলে ভাল মতনই হচ্ছে। হোক। বরপক্ষ আসবে দিল্লি থেকে, প্যাণ্ডেল বাঁধা হবে, আলো জ্বলবে, বিন্নু ফুল চন্দন পরে কনে সাজবে, রেকর্ডে সানাই বাজাবে, আহা—দারুণ হবে। বোধনের দিদির কথা মনে পড়ল। ছেলেবেলায় পাড়ায় যখন বিয়ে হত—বোধন সব সময় ভাবত, দিদির বিয়ের সময় সে একবার দেখে নেবে। মাতব্বার কাকে বলে দেখিয়ে দেবে।

কোথায় কি ভেবেছিল, আর কি হল। দিদি পালিয়ে গেল। শুধু পালিয়েই গেল না, এখন সে অন্য রাস্তায় চলে গেছে। বিশ্বনাথ কোথায়? মারা গিয়েছে নাকি? না, দিদি বিশ্বনাথকে ছেড়ে চলে এসেছে? দিদির সেই ছেলেটারই বা কি হল? আচ্ছা, নীলু বাজে কথা বলে নি তো? বোধনকে ঘা দেবার জন্যে? না, নীলু তেমন মেয়ে নয় কি দরকার তার মিথ্যে কথা বলে।

বোধন দিদির কথা কাউকে বলে নি। বলা যায় না। মা কিংবা বাবা এ-কথা শুনলে কানে আঙুল দেবে। বোধনেরও কেমন কান মুখ গরম হয়ে ওঠে কথাটা মনে পড়লে। ছি ছি। ছি ছি—! তার দিদি প্রস্টিটিউট। ছিছি। মাথা তোলার আর কিছু রাখল না দিদি।

হাউসিংয়ের মধ্যে ঢুকতেই স্কুটার-চাপা দুটি ছেলেকে দেখতে পেল বোধন। ফুল স্লিভ পুল ওভার। মাথায় গরম নাইট ক্যাপ। কাকে যেন খুঁজছে।

বোধনকে দেখতে পেয়ে দাড়িঅলা ছেলেটি বলল, "এই যে দাদা, আমাদের একটু হেল্প করবেন?"

দাঁড়াল বোধন। তাকাল।

"অর্চনা চৌধুরী কত নম্বর ফ্ল্যাটে থাকে? যাদের দেখতে পাচ্ছি জিজ্ঞেস করছি বলতে পারছে না?"

বোধন বুঝতে পারল। চুয়াকে খুঁজছে। নিশ্চয় থিয়েটারের ছেলে। বোধন বলতে যাচ্ছিল, ডেকে দিচ্ছি, হঠাৎ কী ভেবে বলল, "অর্চনা···! মানে যে থিয়েটার করে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ. রাইট।"

"ওই যে ওই বাঁদিকের ব্লকের সেকেণ্ড এনট্রেন্স···দোতলায়।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, দাদা।"

বোধন ইচ্ছে করেই অন্য ফ্ল্যাটের দিকে চলে গেল। ছেলে দুটোকে সে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে গিয়েই বা কি করত! ঘরে ডেকে বসতে দিতে পারত না। বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখতে হত। সেটা বিশ্রী। চুয়া বুঝুক কী করবে।

মানিকদের ব্লকের দিকে সরে গিয়ে আড়ালে দাঁড়াল বোধন, ফাঁকায় নয়, এনট্রেন্সের তলায়। চুয়ার জন্যে বাড়ি বয়ে লোক আসে খুঁজতে। থিয়েটারের লোক। চুয়া কি খুব নাম করে ফেলেছে! এরা কোন ক্লাবের ছেলে? কোন অফিসের? যাক, চুয়ার কিছু একটা হল। মেয়েদের একটু আধটু গুণ থাকলে হয়ে যায় কিছু। কিন্তু ছেলে দুটোকে বলিহারি! এই শীতের মধ্যে স্কুটার চালিয়ে চুয়াকে খুঁজতে এসেছে। তা ছাড়া, দুটোই বোকা, গাধা। পাড়ায় ঢোকার মুখে তারা কি থমথমে ভাবটা বুঝতে পারে নি? রজনী ভার্সেস শান্তদের লড়াই চলছে। ও-দিককার রাস্তার বাতিটাতি নিবোনো থাকে, দোকানপত্রও প্রায় বন্ধ হয়ে যায় রাত হলে। লোকজন ভয়ে ভয়ে চলাফেরা করে। কালও বোমাবাজি করেছে দু দলে। বেপাড়ার ছেলে—রাত্রে এসেছে, ফেঁসে না যায়। বোধনের উচিত ছিল সাবধান করে দেওয়া।

আরও খানিক দাঁড়িয়ে বোধন নিজের বাড়ির দিকে চলল।

মোটাসোটা ছেলেটা স্কুটার নিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। দাড়িঅলা এইমাত্র নেমে এসে বন্ধুর কাছে দাঁড়াল।

ওরা কী বলছে বোধন শুনতে পায় নি। কাছে আসতেই আবার চোখাচোখি।

"কি, দেখা হল ?" বোধন জিজ্ঞেস করল।

"ধ্যুৎ মশাই ; কিসের দেখা ! বাড়ির মধ্যে ফাটাফাটি হচ্ছে। কী চেল্লানি। দরজার কড়া নাড়ছি, শুনতেও পেল না। শেষে এক মহিলা বেরিয়ে এসে আমাকেই মারে আর কি।"

"অর্চনাকে পেলেন না ?"

"না বাড়িতেই নেই বোধ হয়। কোথাও খেপ মারতে গিয়েছে। একটু প্রফেসন্যাল হয়ে গেলে এই সব মেয়েদের আর ধরা যায় নাকি! এই নিয়ে তিন দিন ধরার চেষ্টা করলাম। না পারি ওর ক্লাবে ধরতে, না পারি ওর 'শো'-এর দিন ধরতে।···বাজে থার্ড ক্লাস মাল, বাজারে চলে গেল। স্কেয়ারসিটি মেক্‌স ডিম্যাণ্ড। বন্যা হলে কুমড়োর ফালির দাম চড়ে যায় জানেন তো, দাদা ; এ হল তাই। আচ্ছা চলি, দাদা। ধন্যবাদ। চলো, নির্মল।···আগেই তোমায় বলেছিলাম ওর পিনুদাকে না ধরলে কিস্যু হবে না। যাও পিনুকে তেল মারো।"

স্কুটারে স্টার্ট দিয়ে ছেলে দুটো চলে গেল। দাড়িঅলা দারুণ স্মার্ট। দাঁড়াবার সময় নাচে, কথা বলার সময় গলা ওঠায়। নাটুকে কায়দা। কিন্তু ওদের দু একটা কথা বোধনের ভাল লাগে নি। 'বাজে থার্ড ক্লাস মাল'—মানে কী ? কেন বলল কথাটা ? পিনু কে ? পিনু কি চুয়ার ক্লাবের কেউ ? চুয়া গেলই বা কোথায় ? আজ ওর বাইরে যাবার তোড়জোড় তো বোধন দেখে আসে নি। বোধ হয়, মার চেঁচামেচি শুনে অন্য কোথাও গিয়ে বসে আছে। মা একবার শুরু করলে তো থামে না, তখন বাড়িতে থাকা সত্যিই দায়। ছেলেটা

বোধ হয় মার তাড়া খেয়েছে। তা থাক, কিন্তু অর্চনা চৌধুরীর মা কেমন তা জেনে গেল। ওদের বন্ধুবান্ধবদের কাছে গল্প করবে।

মার মেজাজ এখন গরম। বাড়ি না ঢুকতে পারলে ভাল হত। কিন্তু এই ঠাণ্ডায় বাইরে বাইরে কোথায় ঘুরে বেড়াবে বোধন। বড় শীত করছে।

দরজা খোলাই ছিল। ভেজানো ছিল। বোধন দরজা ঠেলতেই খুলে গেল।

ঘরের ভেতর থেকে গলা শোনা যাচ্ছিল মার। বাবা সেই নিজের জায়গাটিতে টেবিলে বসে। চেয়ারের পাশে দেওয়াল ঠেস দিনে ক্রাচ দাঁড় করানো। বাতি জ্বলছিল আজ।

বোধন চোরের মতন নিঃশব্দে চটি খুলে পাশের ঘরে ঢুকে পড়বে ভাবছিল, দেখল, মা ঘর থেকে বাইরে এল, দুহাতে শাড়ি গুটিয়ে হাঁটুর ওপর তুলেছে।

"একদিন এই নো-ড়া নিয়ে আমি আমার কপালে ঠুকব। ঠুকে ঠুকে মরব। আর তোমাকেও আমি রেহাই দেব না। সে-মেয়ে আমি নই। ওই নোড়া তোমার কপালেও ঠুকব।"

বোধন চুপ করে দাঁড়িয়ে। মা তাকে দেখে নি। বরং বোধন দেখছে, মা কেমন করে নিজের কপালে আর বাবার কপালে নোড়া ঠুকবে তার ভঙ্গিটা মা দেখাচ্ছিল।

বাবা মুখ নীচু করে গাল চুলকোচ্ছে। ভরতি দাড়ি।

"তুমি হচ্ছ পাকা শয়তান। বোবা সেজে বসে থাকো। বসে বসে শয়তানি করো।"

বোধন কিছুই বুঝতে পারছিল না। কী নিয়ে আজ শুরু হয়েছে সে জানে না। অবশ্য শুরু হবার কোনো বিশেষ কারণ মার থাকে না, যে কোনো সময়ে অকারণেও শুরু হতে পারে। মার মরজি।

শিবশংকর বললেন, একেবারে নীচু গলায়, "আমি কথা বলে কি করব ?"

"কেন, তোমার মুখ নেই ? খাবার সময় মুখ হাঁ করতে পার- কথা বলার সময় পার না। ন্যাকামি !"

শিবশংকর চুপ।

সুমতি স্বামীর কাছাকাছি গিয়ে ঝুঁকে পড়লেন। "কেন তু ওকে চিঠি লিখেছিলে ?"

কেমন যেন অসহ্য হল শিবশংকরের। বললেন, "আমি তোমায় হাজার বার বলছি, চিঠি আগে আমি লিখি নি।"

"লেখো নি তো সে আসতে চাইছে কেন ?"

বোধনের বুক ধক করে উঠল। দিদি নাকি ? দিদির চিঠি ? বাবা কি দিদিকে চিঠি লিখেছে ? কেন ? ঠিকানা পেল কোত্থেকে ? তা হলে দিদির সম্পর্কে নীলু যা বলেছে তা সত্যি নয় ? দিদি যদি অতই খারাপ হয়ে গিয়ে থাকবে বাবা নিশ্চয় তাকে চিঠি লিখত না !

"তুমি," শিবশংকর বললেন, "ভেবেচিন্তে কথা বললে আমায় দোষ দিতে না। কী হয়েছে সবই তুমি জান। মাধু আমায় যে চিঠি লিখেছিল তাতে তোমারও চিঠি ছিল। সে লিখেছিল, বছর খানেক ধরে ভুগছে। ওখানকার ডাক্তার কিছু করতে পারছে না, ধরতেও পারছে না। একবার কলকাতায় এসে হাসপাতালে গিয়ে বড় ডাক্তার দেখাতে চায়।...তা তুমি আমায় বললে, জবাব লিখে দিতে। আমি লিখে দিয়েছি। এতে দোষের কি করেছি ?"

"বাজে কথা বোল না, একেবারে বাজে কথা বলবে না," সুমতি হাত তুলে আঙুল নাড়তে লাগলেন শাসনের ভঙ্গিতে, "আমি তোমায় বলি নি তোমার ভাগ্নীকে নেমন্তন্ন করে ডেকে আন। বলেছি ?"

"না, তা বলো নি, তবে…"

"তবে-টবে নয়। আমি বলি নি, তবু তুমি সোহাগ করে ডাকতে গিয়েছ। নিজের পাছায় কাপড় নেই—শঙ্করাকে ডাক। কেন তাকে তুমি ডাকবে?"

বোধন ঘরের দিকে চলে গেল। হয়ত তাকে মা বাবা কেউ দেখে নি। যাক, দিদি নয়, মাধুদি—মানে পিসীমার মেয়ে।

ঘর থেকে বোধন বাবার কথা শুনছিল।

"আমি আর কি করতে পারি! তুমি তো বলে দাও নি যে আসতে বারণ করে লিখে দাও। সম্পর্কে ভাগ্নী, পুষ্প কবে মারা গিয়েছে। না লিখতে পারলাম না। লজ্জা করল।"

"লজ্জা করল! আহা কী আমার লজ্জা পাবার মানুষ!" সুমতি স্বামীকে ভেঙিয়ে বললেন, "তোমার ভাগ্নীর বেলায় লজ্জা, আর নিজের মাগের বেলায় লজ্জাও নেই, মায়াও নেই। সে মরুক। মুখে রক্ত তুলে মরুক। তুমি বাঁচো। আমিও বাঁচি।"

শিবশংকর কোনো জবাব দিলেন না।

সুমতি বোধ হয় আবার ঘরে চলে গেলেন।

বোধন এতক্ষণে ব্যাপারটা অনুমান করতে পারছিল। মাধুদি কলকাতায় আসার জন্যে বাবা-মাকে চিঠি লিখেছিল। মা বাবাকেই জবাব দিয়ে দিতে বলেছিল। বাবা বেচারী ভাগ্নীকে আসতেই লিখেছে। হয়ত সেই চিঠির জবাব এসেছে আজ। বাবা মাকে বলেছে। তারপর ওই নিয়ে বেধে গেছে।

বাবা কাজটা ভাল করে নি। নিজের ভাগ্নী ডাক্তার দেখাতে আসতে চাইলে না করা যায় না। ঠিক, বাবা সেদিক থেকে ঠিকই। কিন্তু এই বাড়িতে মাধুদি এসে কোথায় থাকবে। জায়গা নেই এক ফোঁটাও। এমন কি মাধুদিকে শুতে দেওয়াও যাবে না। রোগী লোক,

সঙ্গে বাচ্চা থাকবে, আর যদি মাধুদির স্বামী থাকে তবে তো হয়েই গেল। বাবা ভুল করেছে। দোষ নেই বাবার। তবু ভুল।

আবার মার পায়ের শব্দ শুনতে পেল বোধন। মুখে কথা নেই রান্নাঘরে গেল বোধ হয়। ডাল পোড়ার গন্ধ আসছে। সারাদিন খেটেখুটে এসে মা আর রান্নায় মন বসাতে পারে না, শরীরেও কুলোয় না, তখন সেদ্ধ ডাল নামিয়ে তার মধ্যে কাঁচা লঙ্কা পিঁয়াজ, এক মুঠো কড়াইশুঁটি দিয়ে দেয়। আর বেগুনপোড়া। কিংবা আলু-ফুলকপির ঘেট। আবার কি! এই যথেষ্ট।

বোধন আবার মার গলা পেল। রান্নাঘর থেকেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে।

"তুমি কালকেই লিখে দাও, এখানে এসে উঠতে হবে না।"

একটু চুপ।

"কি সাড়া নেই যে— ? আবার বোবা ?"

"দেব। লিখে দেব।"

"হ্যাঁ, তাই দেবে।···আমার নাম করে লিখবে না। তোমার নামে লিখবে।"

শিবশংকরের সাড়া পাওয়া গেল না।

বোধন এতক্ষণ ঘরে আলো জ্বালায় নি। জ্বালাবে কিনা ভাবছিল।

সুমতি আবার কথা বলছেন। রান্নাঘর থেকেই। "আমি কেন তোমার ভাগ্নীর দায় অদায় দেখব। আমার যখন মাথার ঘায়ে পাগল হবার যোগাড় হয়েছিল—তখন কেউ দেখেছিল আমায়। ওই তোমার বোনও কি দেখেছিল ? নাকি তোমার সোহাগের ভাগ্নী একটা চিঠি লিখেছিল।···আমি কিছু ভুলি নি, সব মনে করে রেখেছি। তোমার বোন আমার সংসারে আমার গতরে বসে খেয়েছে আর

ন্যাকামি করে ফিট হয়েছে। তার মার কাছে গুজগুজ করত। আমায় একটা ভাল শাড়ি পরতে দেখলে খুঁটত। আবার ঠোক্করও দিত কত : 'তুমি তো দেখতে ভাল, তাই বুঝি বাসন্তী রঙ পরো···।' ···আমি কি বুঝতাম না কিছু। আমি দেখতে ভাল তাতে ওর গায়ে জ্বালা ধরত। স্বার্থপর বদমায়েস, পাজীর দল···।"

শিবশংকর বললেন, "এই একঘেয়ে পুরোনো কথাগুলো কেন তুমি বলো! আমি কাল চিঠি লিখে দেব।"

বাইরে এসেছেন সুমতি। "হ্যাঁ দেবে। স্পষ্ট করে লিখে দেবে, আমরা কোনো ঝক্কি নিতে পারব না। এখানে জায়গা নেই।"

বোধন বাতি জ্বালাল। প্যান্টটা ছাড়ছিল।

সুমতির পায়ের শব্দে মনে হল ঘরে চলে গিয়েছেন।

বোধন প্যান্ট ছেড়ে লুঙ্গি পরে ঘরের বাইরে এল। হাত পা ধোবে। বাথরুমে যাবার সময় দেখল, বাবা ছাদের দিকে মুখ করে অন্ধকার দেখছে। বাবার গায়ে সেই অদ্ভুত চাদর।

বাথরুমে গিয়ে বোধন হাতে মুখে জল দিল। কনকনে ঠাণ্ডা। ফিরে আসার সময় আবার বাবাকে দেখল। কাছেই কার গামছা ঝুলছে। টেনে নিয়ে মুখ মুছল। পা। ঘরে মা চুপচাপ। বাইরে বাবাও বোবা হয়ে বসে মাথার চুল ছিঁড়ছে। বাবার এই এক মুদ্রাদোষ, যখন কিছু ভাবে তখন মাথার চুল ছেঁড়ে। বাবা কী ভাবছে বোধন অনুমান করতে পারল : চিঠির কথা, কাল আবার চিঠি লিখতে হবে মাধুদিকে, বাবার নিশ্চয় মনে লাগছে। ক্ষোভ ও দুঃখ হচ্ছে।

বোধনের মনে হল, বাবাকে কিছু বলা দরকার, যাতে ব্যাপারটা সহজ করে নিতে পারে। অক্ষমতায় দুঃখ পাবার কারণ নেই। তারা অক্ষম। নিজেরাই দুবেলা দুটো মুখে গুঁজে, কোনো রকমে মাথা

বাঁচিয়ে বেঁচে আছে—। এখানে আত্মীয়তা দেখাবার উপায় নেই মা খারাপ কিছু বলে নি।

বোধন একবার মার ঘরের দরজার দিকে তাকাল, তারপর বাবার কাছাকাছি এসে নীচু গলায় বলল, "আমি লিখে দেব না হয়।"

শিবশংকর ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর হঠাৎ বললেন, "না, আমিই লিখে দেব। পাপ যখন আমি করেছি তখন..."

"ব্যাপারটা তুমি বুঝছ না। একটা লোক এসে থাকা বড় কথা নয়, কিন্তু তাকে রাখা, দেখাশোনা করা..."

"আমি বুঝছি। তুমি আমায় বোঝাতে এস না।...তোমার মা শোধ নিতে চাইছে।"

সুমতি একেবারে ঘরের দরজার সামনে। শুনতে পেয়েছেন।

বোধন মাকে দেখেই সরে যাবার চেষ্টা করল।

"কী বললে। শোধ নিচ্ছি!...হ্যাঁ, তাই নিচ্ছি।" বলতে বলতে এগিয়ে এলেন সুমতি। রাগে কাঁপছেন। চোখ খেপার মতন। জ্বালা আর ঘৃণা। গলার স্বর কর্কশ। "কেন শোধ নেব না? তোমাদের সকলের ওপর আমি শোধ নেব। তোমরা ছোটলোক, ইতর, শয়তান। আমায় তোমরা কম পিষেছ? তোমার মা, তোমার বোন, তুমি— কেউ আমায় ছাড় নি!"

বোধন একটু তফাতে সরে গেল। শিবশংকর ভয়ে কাঠ।

"শোনো, এই আমি তোমায় বলে রাখছি—" বলে সুমতি যেন স্বামীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, "সারাটা জীবন আমি শুধু জ্বলেছি। আমাকে তোমরা পুড়িয়েছ ছ্যাঁকা দিয়ে দিয়ে। তোমার মা বলত, আমি ছোটলোকের বাড়ি থেকে এসেছি, তোমার বোন বলত— আমার স্বভাব দোষ আছে..."

"থাক না, ওরা তো স্বর্গে গেছে..."

"স্ব-র্গে ! স্বর্গে যাবার মানুষ। নরকে গিয়েছে।"

"আমি তোমার কাছে মাপ চাইছি—" শিবশংকর জোড় হাত করলেন।

"না, কিসের মাপ ! তোমরা আমার হাড় মাংস রক্ত সব নিয়েছ, আমার ছেলেমেয়েকেও। একটা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেশ্যা হয়েছে, আর-একটা নেচে বেড়াচ্ছে বাইরে—সেটাও যাবে। আমি কিছু বুঝি না। আর ওই আর-এক হারামজাদা, খাচ্ছেদাচ্ছে ডেংডেঙিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মেয়েমানুষের অধম।···আমি যেদিন চিতেয় উঠব, বুঝতে পারবে। মানুষটার জন্যে এক মণ কাঠও লাগবে না। হুস হুস করে পুড়ে যাব।"

মার চোখ-মুখ দেখে বোধনের ভয় করছিল। মাথায় রক্ত চড়ে মুখ লাল হয়ে গিয়েছে।

চোদ্দ

বিন্নুর মা পাঁচ ছটা একশো টাকার নোট বোধনের হাতে গুঁজে দিলেন। বোধন অবাক। কিছু বলতে যাচ্ছিল, ইশারায় বারণ করলেন বিন্নুর মা। ট্যাক্সি পাড়ায় ঢুকছে। একটু পরেই বাড়িতে পৌঁছে গেল। নেমে ভাড়া মিটিয়ে বিন্নুর মা সদরে এসে দাঁড়ালেন। হাতে কালো ব্যাগ। পাশে বোধন! বিন্নুর মা বললেন, 'টাকাটা তোমার কাছে রেখে দাও। কখন কে কি চায় আমার বার বার টাকা বের করতে বিরক্ত লাগে। তুমিই দিয়ে দিও।' এতগুলো টাকা কাছে রাখতে বোধনের ভয় করছিল। যদি হারিয়ে যায়। মেরে নেয় কেউ! কিছু বলতে যাচ্ছিল বোধন, সদর খোলার শব্দ হল, বিন্নুর মা ফিসফিস করে বললেন, 'কাউকে কিছু বলতে হবে না। পরে হিসেব দিয়ো।" দরজা খুলল বিন্নু। বিন্নুর মা কোলের কাছে ব্যাগ ধরে ভেতরে ঢুকলেন। বোধন জানে, ব্যাগে ন' হাজারের বেশী টাকা আছে। সোনার দোকান থেকে পেয়েছেন বিন্নুর মা। বোধন ভেতরে পা বাড়াচ্ছিল, হঠাৎ কি জড়িয়ে গেল।

ঘুম ভেঙে গেল বোধনের। মশারির সঙ্গে পা জড়িয়ে গিয়েছে। সরু ক্যাম্প খাটের একপাশে পা ঝুলে গিয়েছে। কয়েক মুহূর্তে বোধন তেমন হুঁশ করতে পারল না। তারপর বুঝল, সে স্বপ্ন দেখছিল। তার হাতে বিন্নুর মা টাকা গুঁজে দেন নি।

চোখ চেয়ে বোধন একবার যেন সব দেখতে চাইল। কিছুই দেখা যায় না। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। মশারির চাল ঝুলে আছে চোখের

পর। শীত করছিল। একটা পুরোনো ভুট কম্বলের তলায় ময়লা
াথা দিয়ে বোধন শোয়। এতে শীত যায় না। যদিও চারদিকে সব
ন্ধ। উত্তরের জানলাটাও। আর এও আচ্ছা শীত চলেছে
লকাতায়। কমেই না।

বোধন একবার ভাবল, বাথরুমে যাবে। পরের মুহূর্তে ভাবল,
র—কে আবার বাথরুমে যায়। একবার বাইরে বেরুলেই শীত
ায়ের লোম খাড়া করে দেবে, মশা ঢুকবে শয়ে শয়ে। কাঁথা-কম্বল
ারও টেনেটুনে বোধন আস্তে করে পাশ ফিরল। জোরে পাশ
ফিরলেই ক্যাম্প খাট উলটে যাবে।

তা স্বপ্নটা মন্দ নয়। হাতের মুঠায় পাঁচ ছশো টাকা এলে ভালই
াগে। পরের টাকা হলেও। বোধন ইচ্ছে করলেই কিছু সরিয়ে
ফলতে পারত। পঞ্চাশ, একশো, দুশো। কে দেখতে যাচ্ছে। বিনুর
া অত দেখতে চাইবেন না। চাইলেও বোধন ম্যানেজ করতে
ারত। অবশ্য সে কিছুই করত না, টাকাটা সত্যি সত্যি হাতে
াকলেও, বড় জোর দু চার প্যাকেট সিগারেট উড়ত, চা চলত।
তার বেশি কিছু নয়। বিনুর মা বোধনকে বিশ্বাস করেন। যদি
অবিশ্বাসের কাজ করতে হত তবে বোধন পুরো ন' হাজার সাড়ে ন'
হাজার টাকা মারতে পারত। সোনা বিক্রির কোনো রসিদ কেউ
রাখে নি। মারলে কে ধরত!

বিনুর মা বোধনের উপকার নাকি জীবনে কোনোদিন ভুলবেন না
বলেছেন। বলেছেন, 'বিনুর বিয়েটা চুকে চেতে দাও, আমি তোমার
চাকরি করিয়ে দেবোই দেব। ওকে দিতেই হবে।'

বিনুর ব্যাপারটা চুকে যাক। বোধনও আশা করছে, বিয়েটা হয়ে
গেলে বিনুর মার ঝঞ্ঝাট ঝামেলা মিটে যাবে। তখন উনি মন দিতে
পারবেন।

বিনু অবশ্য বেশ একটা মজার কথা বলছিল সেদিন। বিনু বলছিল: 'বোধনদা, তুমি বরং দিল্লিতে চলে যেও।' 'আমি! কেন?' 'আমি রাজুকে বলে তোমার চাকরি যোগাড় করে দেব। আমাদের সঙ্গে থাকবে।' শুনে বোধনের ভাল লাগলেও সে হেসে ফেলেছিল: 'দিল্লি গেলে আমার কেমন করে চলবে বিনু! আমার বাবা খোঁড়া, মার শরীর ভেঙে গেছে। বোনের বিয়ে হয় নি।' 'তা ঠিক, তা ঠিক'...বিনু দুঃখের মুখ করল।

কথাগুলো বোধন উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল। স্বপ্নটা দেখার কোনো মানে হয় না। বিনুর বিয়ের এখনও আট দশ দিন বাকী। বিনুর মার সঙ্গে সোনার দোকানেও যাওয়া হয় নি এখনও। আগামী পরশু যাবার কথা। শুক্রবারে। বিকেলে। শুক্রবার বিনুর কাকার ফিরতে দেরি হয় বলেই বোধ হয় মাসীমা দিনটা বেছেছেন। বোধনের কোনো অসুবিধে নেই। তার কাছে সব দিনই সমান।

একটা ব্যাপার বোধন এই ক'দিনে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে বিনুর মা আর বিনুর কথাবার্তা থেকে। টাকা পয়সার ব্যাপারে বিনুর কাকা কাঁচাখোলা নয়। বিনুর জন্যে হাজার হাজার টাকা খরচ করতে নিজে নারাজ। বিনুর মাকেও করতে দিতে চান না। বিনুর মা কিন্তু যতটা পারেন করবেন, বিনুর কাকার টাকার মুখ চেয়ে তিনি বসে নেই, বসে থাকবেন না। তাছাড়া বিনুর মার ইচ্ছে নয়—খাওয়া-দাওয়ার খরচটা ছাড়া বিনুর কাকার টাকায় এই বিয়ের কিছু হয়। কাকা লোকটা বোধ হয় বেশ হিসেবী। নিজের ভবিষ্যৎ ভাল বোঝেন।

পরের সংসারের হাঁড়ির সব খবর জানা সম্ভব নয়। বোধনও জানে না। তবে, দেখেশুনে তার মনে হচ্ছে, বিনুর ব্যবস্থা করে দেবার পর তার মা আর কাকায় একটা গণ্ডগোলও লেগে যেতে পারে। কিংবা চোখের সামনে থেকে মেয়ে সরে গেলে বিনুর মা আরও খোলাখুলি-

ভাবে কাকাকে নিয়ে সংসারে থাকতে পারবে।

অন্যের কথা ভেবে আর লাভ কি! ভাঙা ঘুম আবার জোড়া লাগাবার আশায় বোধন কম্বলটা প্রায় মাথা পর্যন্ত টেনে নিল, কান ঢাকা থাকলে শীতও কম লাগে।

সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ। হাউসিংও। কোথাও কিছু ডাকছে না। শব্দ হচ্ছে না। এক আধবার দূরের রেল লাইন দিয়ে গাড়ি চলে যাবার শব্দ। নিশ্চয় মালগাড়ি। এখন কোনো লোকাল ট্রেন চলে না।

ভাঙা ঘুম জোড়া লাগছিল না। মা-বাবা তাদের ঘরে ঘুমোচ্ছে। চুয়া তার ঘরে। বোধনের এই শোবার জায়গাটাতে ইঁদুর ছুটছে, আরশোলার দল বাথরুম ভরতি করে রেখেছে। এই ভাবে শুয়ে থাকতে বড় কষ্ট হয়। ক্যাম্প খাটটায় নড়াচড়ার জায়গা নেই। শুয়ে শুয়ে অনেকটা ঝুলে গিয়েছে। মাকে বলবে বোধন। আর-একটা ক্যাম্প খাট তাকে কিনতেই হবে। এ-ভাবে শোয়া যায়! ঝোলা ক্যাম্প খাট, ছেঁড়া শক্ত বালিশ, চাদর বলতে চিট এক টুকরো কাপড়।

এক এক সময়, বোধনের মনে হয়, আকাশ থেকে ঝপ করে পড়ার মতন কিছু টাকা তাদের এই বাড়ির মধ্যে পড়ে গেলে বেশ হয়। এটা এমন কি অসম্ভব! একবার একটা লটারি লেগে গেলেই তারা লাখো-পতি। প্রতি হপ্তায়, প্রতি মাসে কেউ না কেউ তো লাটারির টাকা পাচ্ছেই—হয় এখানকার, না-হয় ভুটান পাঞ্জাব বিহার—কোথাও না কোথাকার। বাবা লটারির টিকিট মাঝে মাঝে আনায় নীচের তলার পালবাবুকে দিয়ে। একবার কেন একটা লাগছে না? বেশ. লটারি না লাগুক বাবা যে ক্রসওয়ার্ড করে তার একটা লেগে যাক, তাতেও তো পঁচিশ ত্রিশ হাজার।

বোধনদের কপালে একটা কিছু লাগুক। একবারের জন্যে তাদের সারা সংসারটা এমন ভাবে গরীব, দীন, হতশ্রী হয়ে গিয়েছে যে আর পারা যাচ্ছে না। ছেঁড়াখোঁড়া তোশকের তুলোর মত সব কালচে, ময়লা। চারদিকে এই তুলো ছড়িয়ে আছে, ঘরে, বিছানায়, মেঝেতে টেবিলে রান্নাঘরে বাথরুমে এমনকি তাদের প্রত্যেকের গায়ে মাথায়। এ-ভাবে আর বাঁচা যায় না। শরীরের রক্ত জল হয়ে গেলে যেমন সবই ফ্যাকাশে, খড়িওঠা, নিষ্প্রাণ হয়ে থাকে, এই সংসারের সবই সেই রকম—বিশ্রী, কুৎসিত, নোংরা। টাকার জন্যে যেন দেওয়ালগুলো পর্যন্ত স্যাঁতসেতে, ঠাণ্ডা, কালচে হয়ে গিয়েছে, বিছানাপত্র দুর্গন্ধে আর উকুনে ভরেছে, ভাঁড়ার খাঁ খাঁ করছে, মেঝে মরার মতন পড়ে আছে।

টাকা টাকা করে তাদের এই ছটফটানি কবে মিটবে? এ-জীবনে না, পরের জন্মে? নাকি কোনোদিনই মিটবে না!

বোধন আবার সোজা হয়ে শুলো। ঘুম আসছে না। এখন কত রাত? দুই না আড়াই? তিন চারও হতে পারে। কিছু বোঝা যায় না। শুধু অন্ধকার ঝুলে আছে চারপাশে।

আচ্ছা, বোধনের হঠাৎ মনে হল, এই সব ছেড়েছুড়ে বিনুর সঙ্গে দিল্লি চলে গেলে কেমন হয়। বিনু তো নিয়ে যেতেই চাইছে। দিল্লি যেমন-তেমন জায়গা নয়। রাজধানী। সেখানে সত্যি সত্যি কিছু জুটে যেতে তো পারে। তাদের এক বন্ধু ফটিক তো দিল্লি গিয়ে গুছিয়ে ফেলেছে বলে শোনা যায়।

বোধনও চলে যেতে পারত। কলকাতায় তার কিছু হবে না। কিন্তু কেমন করে যাবে? বাবা বেচারী পঙ্গু, অক্ষম অথর্ব। মা দিন দিন কেমন অসুস্থ হয়ে পড়ছে। জলেভরা ফোলা শরীর, সারা গায়ে খড়ি উঠছে, সাদা নি-রক্ত চেহারা, অনবরত হাঁফায়, হাঁ করে নিশ্বাস

নেয়। মার দুচোখের তলায় কালি, ঠোঁট সাদা, দাঁতের মাড়ি ভরতি রক্ত।

না, বোধন যেতে পারে না। দু দিকে দুই ফাঁসের মতন মা আর বাবা তাকে আটকে রেখেছে।

'আমার যাওয়া হবে না, বিনু। এ-জন্মে নয়।' বোধন মনে মনে বলল, যেন সত্যিই সে যেতে পারত বিনুর সঙ্গে কিন্তু পারল না।

পনেরো

সকাল থেকেই চুয়াকে ব্যস্ত দেখাচ্ছিল।

এই সময়টায় তার কিছু কাজ থাকে। সকালের চা তৈরি, বিছানা পত্র ঘর পরিষ্কার, রেশনের চাল বাছা, বাজার এলে শাকসবজি ধুয়ে মার কথামতন কেটেকুটে দেওয়া—এই ধরনের টুকিটাকি কাজ। সকালে একটু বেলা করেই ওঠেন সুমতি, তারপর আর সময় থাকে না। শীতের দিন হুহু করে বেলা চলে যায়।

আজ চুয়া বাথরুমে ঢোকার মুখেই জবাকে কিছু বলল। বোধন শুনতে পায় নি।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে চুয়া তাড়াতাড়ি চায়ের পাট নিয়ে বসল ওই ফাঁকে নিজের ঘরদোরও পরিষ্কার করে ফেলল যতটা পারে।

বাবাকে চা দেবার সময় চুয়া বলল, "আমি কিন্তু বেরিয়ে যাব আজ আমার দরকার।"

শিবশংকর কিছু বললেন না। মেয়েকে একবার দেখলেন। চুয়া ঘরে চলে গেল।

বোধন চা খাচ্ছিল।

শিবশংকর বললেন, "কাল এদিকে গণ্ডগোল হয়েছে।"

বোধন এমন বদ্ধ জায়গায় শোয় কিছু শুনতে পায় নি। বলল "কখন? কোথায়?"

"তা এগারোটা সাড়ে এগারোটা হবে," শিবশংকর বললেন "প্রায় আধঘণ্টা ধরে দুমদাম হল।"

বোধন জবাব দিল না। রাত্রে গুলি কিংবা বোমার আওয়াজ-য়াজ এ-পাড়ায় নতুন কিছু নয়। রেল লাইন দূরে, তবে তেমন রে নয়। কাছাকাছি রেল ইয়ার্ডও রয়েছে। রেলের পুলিস আর য়াগান ব্রেকারদের মধ্যে মাঝেসাঝে গুলি বোমার খেলা হয়। হয়ত সই রকম কিছু।

শিবশংকর চায়ের অর্ধেক শেষ করে বিড়ি ধরালেন। জানলার কে তাকিয়ে থাকলেন কয়েক মুহূর্ত। বাইরে রোদ। আলোও বিষ্কার। "তোমার মা এমনিতেই আজকাল কম ঘুমোয় তার ওপর ব্দ টব্দ শুনলে আর ঘুমোতে পারে না।"

বোধন মার ব্যাপারটা বোঝে। রাত্রে মার ভাল ঘুম হয় না। শষ রাত কিংবা ভোরের দিকে ঘুম ঘন হয়। সকালে উঠতে দেরি রে। আসলে সারাদিনের খাটুনি হুড়োহুড়ির পর মার বোধ হয় তই অবসাদ থাকে যে চট করে ঘুম আসে না। তার ওপর নানা শ্চিন্তা। মাথাও গরম হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে শোবার পরও মা র থেকে বেরিয়ে এসে বাথরুমে গিয়ে মাথায় জল দিয়ে নেয়। শীতের দনেও বাদ যায় না। মাথার ব্রহ্মতালুতে জল চাপড়ে চাপড়ে মা রবে। অদ্ভুত সব অভ্যেস মার।

বোধন বলল, "রেল লাইনের দিকে হতে পারে শব্দ।"

"না না, অত তফাতে নয়—কাছেই কোথাও।"

কাছেই ? তবে কি রজনী আর শান্তদের ব্যাপার ? হতে পারে। রজনী আর শান্তদের রেষারেষি এমন একটা অবস্থায় পৌঁছে থেমে আছে যে শুধু একটা দেশলাইয়ের কাঠি ফেললেই হয়। কালী পুজোর সময় থেকেই এটা চলছে। রজনীরা তাদের সাম্রাজ্য বাড়িয়ে ফেলে 'জিজিয়া' আদায় বেশী করছে শান্তরা হটে যাচ্ছে, মোটামুটি এই নিয়ে রেষারেষি। ওটা একটু চাপাচুপি ছিল, তারপর আবার

লেগেছে। দু পক্ষই তৈরী। একটা ছুতো কিংবা সুযোগের অপেক্ষায় আছে। পুলিস এখন রজনীদের যতটা পারে খাতির করে চলছে। কিন্তু শান্তরাও কম যায় না, সোজাসুজি না হলেও বেঁকা রাস্তায় তারাও থানার দু চারজনকে হাত করে রেখেছে। কাজেই উভয় তরফই সেজেগুজে শুধু একটা সুযোগের অপেক্ষায় বসে আছে। পাড়ার লোকজন এটা জানে। জানে বলে সাবধানে চলাফেরা করছে রাত্রে

চা শেষ করে বোধন উঠে পড়ল। মা ঘুম থেকে উঠে চোখ-মুখ ধুয়ে চা না-খাওয়া পর্যন্ত তার কিছু করার নেই। মা টাকা পয়সা দিলে সে বাজারে যাবে।

চুয়া আবার কখন বাথরুমে ঢুকেছিল। ভেজা মুখ, খোলা চুল নিয়ে ঘরে চলে গেল।

আজ আবার কি আছে চুয়ার? এই সাত সকালে?

বোধন ঘরে এল। চুয়া শাড়ির শুকনো আঁচলে মুখ মুছছে ঘষে ঘষে।

"কী ব্যাপার রে? কোথাও বেরুবি?" বোধন জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ। ন'টায় বাস।"

"বাস? কোথায় যাচ্ছিস?"

"কেষ্টনগর। ভাড়া বাসে।"

"কেষ্টনগর। সেখানে কী?"

"শো আছে সন্ধেবেলায়। দুপুরে পৌছে যেতে হবে।"

"শো! মানে থিয়েটার!"

চুয়া মাথার চুল আঙুলে ছাড়িয়ে নিয়ে মোটা চিরুনি দিয়ে আঁচড়াতে লাগল।

"কিসের থিয়েটার?" বোধন জিজ্ঞেস করল!

"কল শো। আমাদের ক্লাবের নয়, আমি ক্লাব ছেড়ে দিয়েছি।

যত প্যাঁচ মারামারি। টাকা দেব বলে দেয় না, দেব-দিচ্ছি করে, বড় বড় কথাই শুধু। তার চেয়ে আমার এই 'মধুচক্র'-ই ভাল। পিনুদা টাকাপয়সা নিয়ে ছ্যাঁচড়ামি করে না।"

বোধন কিছুই বুঝল না। "কত টাকা দেবে তোকে?"

"তিরিশ।"

"তিরিশ।" বলিস কি রে! একবার স্টেজে নামবি, তার জন্যে তিরিশ?"

"একবার মানে? গানও গাইতে হবে।"

বোধন নাক টানল। বোনকে ঈর্ষাও করছিল। তিরিশটা টাকা কত সহজে রোজগার করে চুয়া! "তা তুই ফিরবি কেমন করে?"

"কি জানি। ভাড়া বাসেই ফেরার কথা। তবে বেশি রাত হয়ে গেলে আজ হয়ত ফেরাই হবে না।"

বোধন অবাক হল। রাত্রে বাড়ি ফিরবে না চুয়া! আশ্চর্য। মা কি তাহলে ওকে আস্ত রাখবে। চুয়ার সাহস দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। মা ওকে আস্কারা দিচ্ছে বেশি।

সুমতির সাড়া পাওয়া গেল।

চুয়া চিরুনি মাথায় গুঁজে বেরিয়ে গেল। বোধ হয় সুমতির চা ঢেলে দিতে।

বোধন দাঁড়িয়ে থাকল ঘরে। নিজের বিছানার দিকে চুয়া কিছু-দিন হল তার এক ছবি টাঙিয়েছে। ছোট ছবি। সাজগোজ করে তোলা। মাথায় ফুল। এই ছবি চুয়ার থিয়েটারের ছবি। রীতিমত ভালই দেখায় তাকে।...কোন সিনেমার রঙীন কাগজে একবার ছবিও বেরিয়েছিল চুয়ার। চুয়া আর একটা ছেলে একসঙ্গে আছে, অভিনয়ের ছবি, চুয়া দাদাকে দেখিয়েছিল। 'দারুণ, তুই তো ফেমাস হয়ে যাচ্ছিস রে?' 'কোথায় আর। বংশীদার জন্যেই ছবি। কত হাতে পায়ে

ধরতে হয় একটা ছবি বার করার জন্যে।'

বোধন আগে বুঝত না, এখন সে বুঝতে পারছে, চুয়া ধীরে ধীরে পায়ের তলায় মাটি করে নিচ্ছে। একদিন সে দাঁড়িয়ে যাবে। বোধন পারবে না।

দুঃখ এবং নিজের ওপর কেমন ঘেন্না হল বোধনের। সত্যিই সে অপদার্থ। নীলু তাকে বলেছিল, তুমি পয়সা রোজগার করতে চাও, আমি তোমায় চুরির রাস্তা শিখিয়ে দেব।...না শেষ পর্যন্ত বোধনের বোধ হয় ওই রাস্তাতেই যেতে হবে।

চুয়া ঘরে এল। তার সময় তর তর করে চলে যাচ্ছে। বলল, "কাপড়টা বদলে নিই।"

বোধন ঘর ছেড়ে চলে এল। দরজা ভেজিয়ে দিল চুয়া।

সুমতি চা খেতে বসেছেন। আলগা, এলোমেলো, মিলের শাড়ি। ময়লা। সুমতির পা দুটো ছড়ানো। শাড়িটা বোধ হয় খাটো হয়ে গিয়েছে। চোখ-মুখ ফোলা, চোখ ছলছল করছে, মুখময় অবসাদ। মাথার চুল উস্কোখুস্কো, কপালের কাছে অজস্র পাকা চুল। সুমতি এখনও হাই তুলছিলেন।

শিবশংকর মাঝে মাঝে স্ত্রীর দিকে তাকাচ্ছেন, কিছু যেন বলতে চান, বলতে পারছেন না। চোখ নামিয়ে নিচ্ছেন।

ছেলের দিকে তাকালেন সুমতি। "রোজ রাত্তিরে এত হইহই কিসের হয়?"

সুমতি এমনভাবে বললেন যেন বোধনই হইহই করে বেড়ায়।

"নিজের বাড়িতে শুয়ে রাত্তিরে চোখ বোজার উপায় নেই! কী ছোটলোকের জায়গা।"

বোধন নীচু গলায় বলল, "রেল লাইনের দিকে হবে বোধ হয়।"

"যে লাইনের দিকে হোক, আমার তাতে কি? ঘরে বাইরে

কোথাও এক ফোঁটা শান্তিতে থাকার উপায় রাখল না। যত রাজ্যের গুণ্ডা বদমাশের রাজত্ব হয়ে গিয়েছে।”

শিবশংকর বললেন, “পুলিস আজকাল কিছু করে না। পড়ে পড়ে ঘুমোয়।”

“তোমার মতন সব—” সুমতি স্বামীর দিকে বিতৃষ্ণার চোখে তাকালেন, “খায় দায় নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়।” আবার একবার হাই তুলে চা মুখে দিলেন, বিস্বাদের মুখ করলেন, “চা না গঙ্গাজল!”

বোধন চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। মা টাকা দিলে সে বাজারে যাবে। বাইরে যেতে পারলে রোদটাও গায়ে লাগানো যায়। সকালের দিকে এই বাড়িটা বড় ঠাণ্ডা, কনকনে। মার কিন্তু শীত নেই। গায়ে একটা সুতীর চাদরও মা সকালে জড়াবে না।

শিবশংকর আবার কিছু বলার চেষ্টা করেও থেমে গেলেন। একটু আগেই ধমক শুনেছেন স্ত্রীর।

“নিজের হাতে না করলে কোনো জিনিস মুখে তোলা যায় না—” সুমতি বললেন, “সবই দায়সারা।”

বোধন বলল, “আজ বাজার···”

“বাজারে না গেলে গিলবে কি? যাও আমার ব্যাগটা নিয়ে এসো।”

বোধন মার ব্যাগ আনতে ঘরে গেল।

ফিরে এসে দেখল, চুয়া সেজেগুজে বাইরে এসেছে। হাতে একটা মেয়েলী ব্যাগ। চুয়াকে বেশ দেখাচ্ছিল। মাথার চুল এলো। চোখে বোধ হয় কাজল দিয়েছে। মুখে পাতলা করে পাউডার মাখা। বড় বড় ফুলকাটা ছাপা শাড়ি। নাইলন নাইলন দেখাচ্ছে। গায়ে চাদর।

চুয়া পায়ের দিকের কাপড় টেনে গুছিয়ে নিল। নিয়ে সুমতির দিকে তাকাল। “আমি যাচ্ছি। দেরি হয়ে গেল।” বলে শিবশংকরের

দিকে তাকাল। "কই, দাও ?"

শিবশংকর কেমন জড়সড় হয়ে সঙ্কোচের ভাব করলেন। মেয়ের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে স্ত্রীর দিকে, আবার মেয়ের দিকে তাকালেন।

চুয়া বলল, "কী হল ?"

শিবশংকর আরও আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। অপ্রস্তুত। থুতনির কাছে দাড়ি চুলকোলেন। অস্বস্তি বোধ করছিলেন। স্ত্রীর দিকে তাকালেন। তাকিয়েই আবার চোখ সরিয়ে নিলেন। গলায় কেমন এক শব্দ হল চাপা।

"কি, দেবে না ?" চুয়ার মুখ বিরক্ত হয়ে উঠল, চোখ রুক্ষ।

"আজ হল না," বিব্রত গলায় শিবশংকর বললেন।

"হল না ? বাঃ !" চুয়ার চোখ নাক কুঁচকে, মুখ বিশ্রী হয়ে উঠল।

শিবশংকর হাতে-পায়ে ধরার মতন করে বললেন, "তুই আজ চালিয়ে নে। পরে দেব...।"

সুমতি প্রথমে স্বামী তারপর মেয়ের দিকে তাকালেন। "কী, হয়েছে কী ?"

"বাবা আমার টাকা নিয়েছে, বলেছিল দেব, দিচ্ছে না।" চুয়া ভীষণ রেগে গিয়েছিল।

"টাকা ? কেন ? কিসের জন্যে ?" সুমতি বললেন।

"আমি কেমন করে জানব।" চুয়া রুক্ষভাবে বলল, "আমি তখনই বললাম, দু একটা টাকা নিয়েই তুমি ফেরত দাও না কোনোদিন, দশ টাকা তুমি ফেরত দিতে পারবে না। আমি দিচ্ছিলামই না। তখন আমায় খোশামোদ করে টাকা নিল। বলল, তোর মার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে ফেরত দেব।"

সুমতি স্বামীর দিকে তাকালেন। "তুমি টাকা নিয়েছিলে ?"

অসহায়ের মতন মাথা নাড়লেন শিবশংকর।

"কেন? কিসের জন্যে তুমি ওর কাছ থেকে টাকা নিয়েছ? দশ-দশটা টাকা?"

শিবশংকর চুপ। সমস্ত মুখ লজ্জায়, সঙ্কোচে, অপমানে দীন, করুণ দেখাচ্ছিল।

সুমতির গলা ভীষণ চড়ে গিয়েছিল, মুখও লালচে। "তোমার কিসের টাকার দরকার হল? নেশাভাঙের জন্যে? ঝেঁটা মারি তোমার অমন নেশার মুখে। বসে বসে আর কিছু করতে পার না, শুধু নেশা? এতগুলো টাকার নেশা..."

শিবশংকর কিছু বলার চেষ্টা করেও পারলেন না।

চুয়া বলল, "আমার কাছে একেবারে টাকা নেই। পরশু থেকে বলছি, আমার টাকা ফেরত দাও। রোজ বলে, কাল দেব, কাল দেব। এখন আমি কি করব? আমি বাইরে যাচ্ছি, টাকা আমার চাই।"

সুমতি চিৎকার করে আবার বললেন, "কেন তুমি টাকা নিয়েছিলে, বলো? বোবা হয়ে থাকবে না। বলো, কেন নিয়েছিলে?"

"কেন আর নেবে?" চুয়া ঘেন্নার গলায় বলল, "ওই যে কাগজ আনায়, ক্রস ওয়ার্ড, সেগুলো পাঠায়—।"

"ও! ওই ছাইভস্ম। ওরা টাকা নিয়ে বসে আছে তোমার জন্যে। কী নির্লজ্জ বেহায়া তুমি? পেটে ভাত জোটে না, পেছনে কাপড় নেই, টাকা খরচা করে তুমি জুয়া খেল। ছি ছি, গলায় দড়ি তোমার।"

চুয়া টাকা পাবে না বুঝে নিয়ে বিশ্রীভাবে বাবাকে বলল, "আর তুমি কখনো আমার কাছে টাকা চাইবে না। মিথ্যুক কোথাকার। টাকা নেবার সময় খুকি খুকি। ফেরত দেবার সময় মাকে দেখাও।

ফেরত দেবার মুরোদ নেই টাকা নাও কেন? খালি ধাপ্পাবাজি।"

চুয়া রাগে ঘেন্নায় মুখ কালো করে পেছন ফিরল। আর দাঁড়াবার সময় নেই তার।

হঠাৎ, একেবারে হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেলেন সুমতি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মেয়ের দিকে হাত বাড়ালেন, ধরতে গেলেন মেয়েকে। "কি বললি তুই?"

চুয়া মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে মুখ ঘোরাল। "ঠিক বলেছি।"

চলে যাচ্ছিল চুয়া সুমতি চেয়ার থেকে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে মেয়ের চাদর ধরে ফেললেন। "যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। নিজের বাপকে ধাপ্পাবাজ বলিস। আজ আমি তোর মুখ ভাঙব। হারামজাদী।"

চুয়া নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে চাদর ধরে টানল। তারও মাথায় আগুন উঠে গেছে। "ধাপ্পা মারে তো ধাপ্পাবাজ বলব না। …ছেড়ে দাও আমাকে।"

নিজেকে প্রচণ্ড জোরে টান মেরে ছাড়িয়ে নিতে গেল চুয়া। তার গায়ের চাদর খুলে গেল। সুমতির হাতে থাকল চাদরটা।

চাদর টান মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে সুমতি মেয়েকে ধরতে গেলেন। তাঁর আঁচল খুলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। চুয়া দরজার দিকে চলে যাচ্ছিল। তার শাড়ির আঁচলটা সুমতির হাতে এসে গেল। ধরে টানতে লাগলেন।

চুয়া তার শাড়ি আর ব্যাগ বাঁচাতে বাঁচাতে বলল, "ছেড়ে দাও আমায়।"

"ছেড়ে দেব? তোর মুখ আমি ভাঙব। সাপের পাঁচ পা দেখেছিস না—?" সুমতি প্রাণপণে মেয়েকে টানতে লাগলেন তার শাড়ি ধরে।

চুয়া নিজেকে ছাড়াবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। রাগে, জ্বালায় সে হিংস্র হয়ে উঠেছিল। বাঁ হাতে ব্যাগ, তবু দুহাতে শাড়ির আঁচলের বাকীটা ধরে সে টানছে। "আমায় ছেড়ে দাও বলছি। শাড়ি ছিঁড়ে যাবে আমার।"

"ছিঁড়ুক। তোর শাড়ি আমি কুচি কুচি করে ছিঁড়ব। আগুনে দেব। তোর বড় বাড় বেড়েছে। এত বড় আস্পর্দা তোর তুই তোর বাপকে মুখ ঝামটা দিয়ে কথা বলিস। গালাগাল দিস। আজ তোরই একদিন, না আমারই একদিন।"

ঝটকা মেরে শাড়ি ছাড়িয়ে নিল চুয়া। "আগুন দেবে না? একটা সুতো কিনে দিতে পার না, শাড়ি আগুনে দেবে। আমি নিজের রোজগারে এ-শাড়ি কিনেছি।"

সুমতি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কোনো হুঁশ ছিল না। মুখ লাল। চোখ জ্বলছে ঘৃণায়, অপমানে। সমস্ত শরীর কাঁপছিল। গলার স্বর যত তীক্ষ্ণ তত কর্কশ! প্রায় লাফিয়ে পড়ার মতন করে এগিয়ে তিনি মেয়ের চুল ধরলেন মুঠো করে। "তোকে আমি রোজগার দেখাচ্ছি!" মেয়েকে ঠাস করে চড় মারলেন। "বাইরে নেচে, ধাড়ি ধাড়ি মদ্দাগুলোর গায়ে ঢলে তুই পয়সা রোজগার করিস, তা আমি জানি না।" সুমতি চুলের ঝুঁটি ধরে মেয়েকে টানতে লাগলেন। "রোজগার!" আবার ঠাস করে চড় মারলেন। "আমাকে রোজগার দেখাতে আসিস, হারামজাদী!"

চুয়া নিজেকে বাঁচাবার জন্যে মরিয়া হয়ে সুমতিকে ধাক্কা দিতে গেল। তার হাতেব ব্যাগ মুখে লাগল সুমতির। সুমতি 'উঃ' করে যন্ত্রণার শব্দ করে চোখ বুজলেন। চুল ছেড়ে দিলেন। দিয়েই পর মুহূর্তে হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা কেড়ে নিলেন। তারপর ব্যাগ দিয়ে পাগলের মতন মারতে লাগলেন মেয়েকে। চুয়াও কেমন বেপরোয়া।

চুয়ার গায়ের কাপড় খুলে মাটিতে লুটোচ্ছে, চুল পাগলের মতন, গালে দাগ বসে গেছে আঙুলের, হাতের একপাশ ছড়ে গেছে। সুমতি তখনও পাগলের মতন ব্যাগ দিয়ে মেরে যাচ্ছেন মেয়েকে।

চুয়াও হাত ছুঁড়ছিল। খামচা-খামচি করছিল। কাঁদছিল।

শিবশংকর চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে উঠে বার বার বলছিলেন, "কি করছ, ছেড়ে দাও। সুমু ছেড়ে দাও। ছি ছি। একি কাণ্ড! মেরে ফেলবে নাকি ওকে?"

বোধন কোনো পক্ষকেই ধরবার সাহস করছিল না। মাকে এ-সময় সামলাতে যাওয়া বিপদ। চুয়া যা বলেছে তাতে মার মাথায় আগুন জ্বলে যাওয়া অন্যায় নয়। চুয়ার একটু শিক্ষা হওয়া উচিত। সত্যি, সে বড্ড বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু মা-মেয়ের এই কুৎসিত ঝগড়া, মারপিট তার ভাল লাগছিল না। এত জোর চেঁচামেচি হচ্ছে যে ফ্ল্যাটের বাইরে হয়ত কান পাতছে কেউ কেউ!

চুয়া কাঁদছিল। কাঁদছিল আর ভাঙা কান্না জড়ানো গলায় হিংস্রের মতন যা মুখে আসে বলছিল। সে কাউকে বাদ দিচ্ছিল না। বাবাকে নয়, মাকে নয়, বোধনকেও নয়।

"আমার রোজগারের পয়সা নাও, আবার আমায় লাথি মারো। ভগবান দেখছে, তোমার ওই পা খোঁড়া হবে।"

"তোর মতন মেয়ের রোজগারের পয়সায় আমি থুতু ফেলি। হারামজাদী।"

"তুমি মিথ্যুক। তুমি পয়সা নাও না?"

"তুই কার পয়সায় খাস? কার বাড়িতে থাকিস? কে তোকে এতকাল খাইয়ে পরিয়ে এসেছে? তোর থিয়েটারের দাদারা?"

"খাওয়াতে পরাতে পারবে না তো জন্ম দিয়েছিলে কেন। লাথি-

ঝাঁটা মারার জন্যে ? স্বামীভক্তি দেখাচ্ছ ?”

মা আচমকা চুয়ার মুখের ওপর ব্যাগ দিয়ে মারল। পর পর।

চুয়া সামলাতে পারল না। যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল।

“তুই বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে ! ছোটলোক, শয়তান মেয়ে কোথাকার ! যা বেরিয়ে যা—। যেখানে তোর জোটে সেখানে চলে যা… ।”

“যাব। এ-বাড়িতে আর থাকব না।”

“যা, মরগে যা— । আমায় ভয় দেখাস না। একজন গিয়েছে— তুইও যা।”

বোধন আর সহ্য করতে পারল না। মার হাত থেকে ব্যাগ কেড়ে নিল। “কি করছ ! মেরে ফেলবে ওকে ?”

“মরুক ও।” সুমতি জোরে জোরে হাঁফ নিচ্ছিলেন। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে শ্বাস টানতে। চোখের দৃষ্টি উন্মাদের মতন। সমস্ত মুখ টকটকে লাল হয়ে গিয়েছে।

চুয়ার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল। জোরেই কাঁদছিল। তার শাড়ির আধখানা মাটিতে লুটোচ্ছে, মাথার চুল এলোমেলো। জামা ছিঁড়েছে। গালে ঘাড়ে পিঠে দাগ ফুটেছে মারের।

বোধন সুমতিকে টানতে টানতে ঘরের দিকে নিয়ে চলল।

চুয়াও তার ঘরে চলে যেতে যেতে বলল, “এ-বাড়িতে আমি থাকব না আর। যদি থাকি আমার মরা মুখ দেখবে তোমরা।”

“হ্যাঁ ; তাই দেখব। তুই মর।”

“তুমিও মরো।”

চুয়া গিয়ে দরজা বন্ধ করল বিকট শব্দ করে।

শিবশংকর পাথরের মতন দাঁড়িয়ে। তাঁর অসহায়, দীন, করুণ মুখ

আরও কাতর, দগ্ধ দেখাচ্ছিল। বিহ্বল, বিমূঢ়। সমস্ত দৃশ্যটাই যেন তাঁর কাছে দুঃস্বপ্নের মতন। শূন্য, নির্বোধ দৃষ্টি। অনুশোচনায় বার বার মাথা নাড়ছিলেন।

ঘরে এনে বোধন সুমতিকে বিছানায় বসাল। "জল খাবে?"

সুমতি মাথা নাড়লেন।

বোধন জল এনে দেখল, মা বিছানায় শুয়ে পড়েছে কেমন ভাবে যেন।

ষোল

শীতের সকাল ফুরিয়ে বেলা গড়িয়ে কখন যে দুপুর হল বোধনরা ানতে পারল না। বাড়ি একেবারে স্তব্ধ, নিঃসাড়। গলা উঠছে না ারও। কি যেন হয়ে গিয়েছে বাড়িতে। আশপাশের ফ্ল্যাট থেকে একজন এসেছিল। দাঁড়িয়ে থেকে প্রায় নিঃশব্দে চলে গিয়েছে। মতি তাঁর ঘরে, বিছানায়। অদ্ভুতভাবে শুয়ে আছেন: দু-পা দু-কে ছড়ানো, দুহাত বিছানায় যেন লুটিয়ে রয়েছে, কোনো রকমে ায়ে শাড়িটা জড়ানো, চোখের পাতা বন্ধ। শ্বাস আছে। কোনো চতনা নেই।

সকালে, মেয়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাটির পর সুমতি তাঁর ঘরে বিছানায় কছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর একবার উঠেছিলেন। উঠে বাথরুমে গলেন। তারপর হঠাৎ বমি তোলার বিকট শব্দ করতে করতে দরজা ুলে বেরিয়ে এলেন, টলে পড়ছেন, শাড়িটাও পরা হয় নি, ধরে রখেছেন কোনো ভাবে, কি যেন বলার চেষ্টা করছিলেন, হয়ত লছিলেন—অফিস যাবেন না, কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল, টলতে টলতে গয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়।

বোধন বাড়িতেই ছিল। শিবশংকর চুপচাপ তাঁর জায়গায় বসে খনও কপাল আড়াল করছিলেন, কখনও দু আঙুলে চোখের ভুরু টপে মুখ নীচু করে বসে ভাবছিলেন কিছু, মাথার চুল তুলছিলেন অন্যমনস্কভাবে। চুয়া তার ঘরে। দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। তার কান্না তখনও ঘরের ভেতর থেকে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল।

জবা নীচের তলায় কাজ সেরে ওপরে এসে বাড়ির অবস্থা দে
কি বুঝল সেই জানে, রান্নাঘরে গিয়ে খুটখাট কিছু করছিল।

সুমতিকে ওইভাবে বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঘরের দিকে যে
দেখে বোধন মার ঘরে ছুটল।

ততক্ষণে সুমতি বিছানায় শুয়ে পড়েছেন!

"বাবা!" বোধন ডাকল।

শিবশংকর ক্রাচ টেনে নিয়ে লাফাতে লাফাতে ঘরে এলেন।

"মা কি বলছে?"

সুমতি যে কী বলছিলেন কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না, অস
জড়ানো, অনেকটা তোতলানো কথা; জিব যেন জড়িয়ে বেঁকে যাচ্ছে
বোধ হয় মাথার যন্ত্রণার কথা বোঝাতে চাইছিলেন।

বোধন তাড়াতাড়ি জল এনে চোখে কপালে দিল। পাখা খু
দিল ঘরের। পাখা চলল না। শিবশংকর হাত পাখা চাইলেন।

চাপা গলায় শিবশংকর ছেলেকে বললেন, "রাত্তিরে ঘুমো
পারে নি, সকালে এই চেঁচামেচি, মাথার আর দোষ কি!"

"কথা জড়িয়ে যাচ্ছে কেন?"

"বুঝতে পারছি না।" শিবশংকর বিছানার একপাশে, স্ত্রীর মাথা
কাছে বসে পাখার বাতাস করতে লাগলেন। হাত দিলেন কপালে
"কী হয়েছে, সুমু? ও সুমু?"

যে-যন্ত্রণা বোঝানো যায় না—অথচ বোঝাতে চান—সুমি
অনেক কষ্টে চোখের কাতরতার মধ্যে দিয়ে বোঝাতে চাইলে
তারপর সুমতির চোখের পাতা বন্ধ হল। গালের একটা দিক কেম
মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিল, বেঁকে যাচ্ছিল, গলার মধ্যে থুতু জমে শ
হল অদ্ভুত।

সামান্য পরেই সমস্ত থেমে গেল; আর কোনো শব্দ নয়, অস্থির

য়, একেবারে স্থির। শুধু শ্বাস প্রশ্বাস পড়ছিল।

ভয় পেয়ে গেল বোধন। "সাহা ডাক্তারকে ডেকে আনি, বাবা! অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে।" ভীত, উদ্বিগ্ন গলায় শিবশংকর বললেন, ্যা, আনো।" বলেই তাঁর টাকার কথা মনে পড়ল। ডাক্তারের কা? সুমতির ব্যাগে কি আছে তিনি জানেন না।

বোধন আর দাঁড়াল না।

সাহা ডাক্তার বেলা ন'টা পর্যন্ত এ পাড়ায়, তারপর চলে যান ার পুরোনো পাড়ার চেম্বারে। ঘণ্টা দুই আড়াই পরে আবার ফরেন। বোধন সাহা ডাক্তারকে পেল না। নরেন ডাক্তার আটটার র বেরিয়ে যান হাসপাতালে, ফেরেন দুপুরে। সুকুমারকে দোকানে াতে পেরেছিল বোধন। সুকুমার ছোটাছুটি করছিল বোধনের সঙ্গে। ার আবার আজকেও ব্যাংকে যাবার কথা। সেই চিঠি নিয়ে ছোটাছুটি রছে ক'দিন। শেষ পর্যন্ত হাতুড়ে দে-ডাক্তারকেই নিয়ে ফিরল াধন। সুকুমার বলল, 'কি করবি, ওকেই নিয়ে যা। আমি কাজ রে আসছি।' দে-ডাক্তার এল আর গেল। পাঁচটা টাকা পকেটে রলো। দুটো ওষুধের নাম লিখে দিল।

সুমতির নাকের কাছে আঙুল ধরলে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের বাতাসটুকু নুভব করা যায়, বুকে হাত রাখলে হৃৎপিণ্ডের ধাক্কাটুকু হাতে বোধ রা সম্ভব, নয়ত মানুষটাকে মৃত বলেই মনে হত।

শিবশংকর স্ত্রীব মাথায় বাতাস দিচ্ছেন মাঝে মাঝে, চুলে আঙুল লিয়ে দিচ্ছেন, কপালে হাত রাখছেন, হঠাৎ হঠাৎ নীচু গলায় াকছেন, 'সুমু—?' তাঁর চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছিল তিনি উন্মুখ হয়ে ত্যাশা করছেন, সুমতি যে-কোনো সময়ে চোখ খুলে তাকাবেন।

বোধন অস্থির হয়ে পড়ছিল। ঠায় মার ঘরে দাঁড়িয়ে থাকতে ারছিল না। একবার মার ঘরে আবার বাইরে খাবার জায়গায়।

চুয়ার ঘরের দরজায় ধাক্কাও দিল বার কয়েক। দরজা খুলল না চুয়া
সে দরজা খুলবে না।

জবার কিছু করার ছিল না। সে সবই দেখেছে। অত কিছু বুঝতে
না পারলেও নীচে গিয়ে খবর দিয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে সুমতির ঘরে
গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। দেখছে সুমতিকে। আবার ফিরে আসছে। বোধনকে
জিজ্ঞেস করেছে বার কয়েক সুমতির কথা।

"দাদা, আমি দুটো ডালভাত করে দিয়ে যাব? উনুনে আঁচ চলে
গেল?"

"না জবাদি, থাক। তুমি বরং যাও। বিকেলে একবার এসো।"

বোধন আর দেরি করল না। হাতুড়ে দে-ডাক্তারকে বিশ্বাস নেই
শালা কিছু বোঝে না। আবার সাহা ডাক্তারের কাছে ছুটল
সুকুমারদার কাছ থেকে সে দশ বারোটা টাকা নিয়েছিল। আর ক'টা
মাত্র আছে। দু তিনটে। টাকার কথা পরে ভাবা যাবে।

সাহা ডাক্তার এলেন অনেকটা বেলায়। দেখলেন। "কখন হয়েছে?

"সকালে। বাথরুমে গিয়েছিল..." শিবশংকর বললেন বিহ্বল
গলায়।

একটা ইনজেকসান শেষ করে আর-একটা তৈরি করছিলেন
"প্রেসার চেক্ করতেন?"

শিবশংকর চুপ। সুমতি কিছুই করত না। করতে পারত না।

"হসপিটালাইজ করতে হবে," সাহা বললেন। তাঁর চোখের তলায়
ঘন উদ্বেগ।

"হাসপাতাল?" শিবশংকর ভীত, অসহায় চোখে তাকালেন।

"অ্যাজ আরলি অ্যাজ পসিব্ল্," সাহা ডাক্তার দ্বিতীয় ইনজেক
সানটা দিতে লাগলেন। সাবধানে, যত্ন করে।

বোধন বিছানার পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে। তার বুক ভয়ে কাঁপছিল

াকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে! কেন? কোন্ হাসপাতালে? কেমন করে পাঠাবে? হাসপাতাল কি ভর্তি করবে? বোধন শুনেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন ধরনা দিয়েও হাসপাতালে জায়গা পাওয়া যায় না। বড় কাউকে ধরলে হয়। বোধন তেমন কাউকে জানে না। এ-দিককার এম এল এ-কে সে চোখে দেখে নি কখনও।

ইনজেকসানের ছুঁচ বার করে নিলেন সাহা ডাক্তার। সুমতির দিকে তাকিয়ে বসে থাকলেন কয়েক মুহূর্ত। কিছু লক্ষ করছিলেন। তারপর সিরিঞ্জ পরিষ্কার করতে লাগলেন। মুখ দেখে মনে হচ্ছিল ভাবছেন।

"বাড়িতে—" শিবশংকর কিছু বলতে যাচ্ছিলেন।

"না না, বাড়িতে নয়। বাড়িতে কখনো নয়—।"

"হাসপাতালে নেবে?" বোধনের গলা শুকিয়ে প্রায় বসে গিয়েছিল।

"আমি লিখে দিচ্ছি। এমার্জেন্সি কেস। নেবে। আর জি কর-এ যাও, কাছাকাছি হবে।"

শিবশংকর ঝুঁকে পড়ে স্ত্রীর মুখ দেখছিলেন। যেন দু দুটো ইনজেকসানের পরও কি সুমতি একবার চোখ খুলে তাকাবেন না? ব্যাকুল, অসহায়, বিভ্রান্ত দৃষ্টি।

ঘরে কেমন একটা গন্ধ উঠছিল অ্যালকোহল কিংবা রেকটিফায়েড স্পিরিটের। গন্ধটা বোধনের নাক থেকে যেন মাথায় চলে যাচ্ছিল। সমস্ত ঘর কী ঠাণ্ডা!

সিরিঞ্জ সাবধানে রেখে সাহা ডাক্তার আবার একবার স্টেথস্কোপ কানে লাগালেন। ঝুঁকে পড়ে সুমতির বুক পরীক্ষা করার সময় মুখ গম্ভীর হচ্ছিল। নাড়ি দেখলেন। ভাবলেন কিছু। নিজের ডাক্তারী-ব্যাগ দেখলেন, হাতড়ালেন, বিড়বিড় করে কিছু বললেন, নিজের মনেই।

ভাবলেন আবার। সিরিঞ্জ স্টেরিলাইজ করতে লাগলেন।

বোধনের নীলুর কথা মনে পড়ল। নীলু হাসপাতালে চাকরি করে। নীলুর কাছে যেতে পারলে কিছু হয়। কিন্তু নীলুর এখন ডিউটি, কি ডিউটি নয় বোধন জানে না। তা ছাড়া, অতবড় হাসপাতালে কোথায় সে নীলুকে খুঁজে পাবে! যদি নীলু বাড়িতে থাকত বোধন গিয়ে বললে, নীলু যতটা পারত করত। এখন এ-সময়ে নীলুর জন্যে ছোটাছুটি করা বৃথা। অনর্থক সময় নষ্ট হবে, কাজ হবে না।

সাহা ডাক্তার তৃতীয় ইনজেকসানের জন্যে তৈরী হলেন।

বোধন জানলার কাছে সরে গেল। নীচে মাঠে চড়ুইয়ের ঝাক ঘূর্ণির মতন উড়ে কাঁটা ঝোপের গায়ে বসল। আবার উড়ে গেল। প্রতিমাদি ফিরে আসছে। জংলী সাইকেল চড়া শিখছে। বাইরে সব সেই রকম যেমন নিত্যদিন থাকে। তাদের বাড়িতে আচমকা সব পালটে গেল। বোধনের বুক ভারী, ভীষণ ভারী লাগছিল।

সাহা ডাক্তার কখন যে ইনজেকসান শেষ করে প্যাডে খস খস করে লিখছেন বোধন খেয়াল করে নি। খেয়াল হল তাঁর কথায়। "লিখে দিয়েছি। এই নাও।...যত তাড়াতাড়ি পার শিফ্‌ট্ করো।"

"একটা ট্যাক্সি...?"

"না না, ট্যাক্সিতে নয়। নেভার। ইট্ মাস্ট বি বাই অ্যাম্বুলেন্স। উইথ্ অল কেয়ার।"

সাহা ডাক্তার তাঁর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে লাগলেন।

"কী হয়েছে ডাক্তারবাবু? শিবশংকর ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

"সেরিব্রাল হেমারেজ।"

শিবশংকর নির্বাক। চোখের পাতা পড়ছিল না। শেষ পর্যন্ত উদ্বেগ, ভয়, বেদনা গলার তলায় আটকে রেখে বললেন, "বাঁচবে তো?"

সাহা ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন। "হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। যত তাড়াতাড়ি পারেন। তারপর ভগবান···। চলো বোধন, আমায় একটু নীচে নামিয়ে দাও।"

শিবশংকর এমন করে নিঃশ্বাস ফেললেন, মনে হল তিনি যেন হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন। বোধন বাবার দিকে তাকাল। এমন নিঃস্ব, রিক্ত মূর্তি বাবার সে দেখে নি। বাবার চোখে জল ভরে উঠছিল।

নীচে নেমে হাউসিংয়ের বাইরে আসতেই সাহা ডাক্তার সাইকেল রিকশা পেয়ে গেলেন। ডাকলেন।

"ডাক্তারবাবু আপনার···" বোধন আড়ষ্ট গলায় কিছু বলতে যাচ্ছিল।

"ঠিক আছে, এখন ওসব নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। একটা অ্যামবুলেন্সের চেষ্টা করো। মাকে হাসপাতালে পাঠাও। আগের কাজটা আগে করো। সময় নষ্ট করো না।···পাঠাও। বিকেলে আমায় একটা খবর দিও।"

"মা বাঁচবে না?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। বাঁচবে না কেন! আগে অ্যামবুলেন্স ডাকো।"

সাইকেল রিকশা করে সাহা ডাক্তার চলে গেলেন।

অ্যামবুলেন্স কোথায় পাবে বোধন? কেমন করে পাবে? অ্যামবুলেন্স সে রাস্তায় দেখেছে আকছার, কিন্তু কোথায় গিয়ে কেমন করে তাদের আনতে হয় সে জানে না। সুকুমারদা থাকলে এ-সব ভাবতে হত না। নিশ্চয় জানে। তাদের হাউসিংয়ের কাজের লোক কাউকে এখন পাওয়া যাবে না, সব অফিস বেরিয়ে গিয়েছে। বুড়ো, রিটায়ারড্ দু একজনকে পাওয়া যাবে। লাহিড়ী জ্যাঠাকে মনে পড়ল তিনি বলতে পারবেন।

বাবাকে একবার বলে আসা উচিত বোধন অ্যামবুলেন্সের খোঁজে যাচ্ছে।

বোধন দিশেহারার মতন ছুটতে ছুটতে ফ্ল্যাটে ছুটল। সিঁড়ি উঠল লাফ মেরে মেরে।

খোলা দরজা। বোধন হাঁফাতে হাঁফাতে ঘরে ঢুকল। "অ্যাম-বুলেন্স কেমন করে আনতে হয়?"

"ফোন করতে হবে।"

"ফোন?" বোধন ফোনের কথা ভাবছিল। কোথা থেকে ফোন করবে? ঘোষ কাকাদের ফোন আছে। বাদলদাদের আছে। ওষুধের দোকানেও আছে। সাহা ডাক্তারকেই বললে হত। তিনি বাড়ি থেকে ফোন করে দিতেন।

"নম্বর?"

"ফোন গাইডে পাবে। প্রথমের দিকেই আছে।"

"আমি তা হলে যাচ্ছি। তুমি একলা থাকবে? চুয়াকে ডেকে দেব?"

"না। একলাই থাকব।"

বোধন চলে যাবার সময় দেখল, চুয়ার ঘরের দরজা খোলা বাথরুমে জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। চুয়া বেরিয়েছে।

চুয়ার ওপর রাগে গা-মাথা জ্বলে যাচ্ছিল বোধনের। কত বড় অসভ্য, শয়তান মেয়ে! বদমাশ, পাজী, উল্লুক কাঁহাকার! তুই এ কি করলি? তোর কি কোনো বোধ বুদ্ধি নেই? এত স্বার্থপর, নোংরা হয়ে গিয়েছিস? তুই বাবাকে অপমান করলি, গালাগাল দিলি। তুই মার সঙ্গে ছোটলোকের মতন ঝগড়া করলি? হাত তুললি মার গায়ে। মাকে বললি, 'তুমি মরো।' কি করে বললি? থিয়েটার করে করে থিয়েটারী কথা শিখেছিস? এত ইতর, এত ছোটলোক হয়ে

গিয়েছিস ? বস্তি বাড়ির মেয়েরাও তাদের মার সঙ্গে এমন করে কথা বলে না—যা তুই বললি। ঠিক আছে। এর শোধ তুই পাবি। দাঁড়া, মা একটু ভাল হয়ে উঠুক তারপর আমি তোকে দেখব। তোর বড় বড় কথা, থিয়েটারী মেজাজ আমি বার করে দেব। হতচ্ছাড়া, পাজী, বদমাস মেয়ে কাঁহাকার।

বোধন ছুটছিল। টেলিফোন করবে ঘোষদার বাড়ি থেকে।

সুকুমারদা কখন ফিরবে কে জানে! সুকুমারদা কাছে থাকলে বোধন সাহস পেত। গৌরাঙ্গও নেই। অফিসে।

আচমকা বিন্নুর মার কথা মনে পড়ল বোধনের। আজ শুক্রবার। বিন্নুর মাকে নিয়ে আজ বিকেলে তার সোনার দোকানে যাবার কথা। বিন্নুর মা অপেক্ষা করবেন। হাতে আর সময় নেই বিন্নুর মার। আসছে শুক্রবারে বিন্নুর বিয়ে। আজ বিন্নুও তাকে যেতে বলেছিল। তার কি কথা আছে!

কিন্তু বোধন তো যেতে পারবে না। সে অ্যামবুলেন্স ডাকবে। মাকে নিয়ে হাসপাতালে যাবে। কতক্ষণ থাকতে হবে হাসপাতালে কে জানে! কে বলতে পারে মার কি হবে!

বোধনের হঠাৎ ঠাকুর দেবতা ভগবান কালী শিব জগদ্ধাত্রী কত কি মনে পড়ল। ভগবান কি বিপদ থেকে বাঁচাবেন না ? বোধন দুহাত কপালে ঠেকাল। আমার মাকে তোমরা বাঁচিয়ে দাও, ঠাকুর। আমার বাবাকে তোমরা শাস্তি দিয়েছ। মাকে আর দিও না। আমার মাকে বাঁচিয়ে দাও, বাঁচিয়ে দাও।

বোধন শীতের দুপুরে কাঁদতে কাঁদতে ছুটছিল। হাঁফাচ্ছিল। তার কপাল গাল ঘাড় গলা দিয়ে অনবরত ঘাম গড়িয়ে পড়ছে।

ছেলেমানুষের মতন বোধন ফোঁপাচ্ছিল আর ছুটছিল।

সতেরো

বিকেল কখন এসেছিল, এসে চলে গেল বোঝা গেল না। হালকা অন্ধকার দেখতে দেখতে গাঢ় হয়ে আসছিল। শেষ মাঘের শনশনে হাওয়া বিকেল থেকে আরও জোর হয়ে উঠেছে।

বোধনের অস্থিরতা এখন কেমন যেন শান্ত হয়ে আসছে। হয়ত আর সহ্য হচ্ছিল না বলে, বা শারীরিক অবসাদের জন্যে। আর কতক্ষণ সহ্য করা যায়? কতক্ষণ আর বসে থাকা যায় ধৈর্য ধরে?

সুকুমার বলল, "কিরে, এখনও পাত্তা নেই?"

বোধনের জবাব দেবার মতন কিছু ছিল না। সেই দুপুর থেকে, বড় জোর দুপুরের শেষ থেকে চেষ্টা করছে, তবু অ্যামবুলেন্স এল না। দু তিন বার, অপেক্ষা করে, অধৈর্য হয়ে সে ছুটে গিয়েছে ফোন করতে। প্রত্যেক বারই এক কথা: 'গাড়ি এলে পাঠাচ্ছি।' 'একটু তাড়াতাড়ি করুন প্লিজ, আমি কত বার ডাকছি বলুন, দুপুর থেকে বসে আছি।' কিছু করার দরকার নেই, দাদা; গাড়ি কম। সকাল থেকে দুটো গাড়ি ব্রেক ডাউন। রাস্তায় পড়ে আছে। তারপর শহরের হাল দেখছেন তো। গাড়ি এলে যাবে। অত তাড়া থাকলে সেণ্ট জনস্‌য়ে ফোন করুন, রিলিফ সোসাইটিতে খোঁজ নিন।'

বোধন খোঁজ করে করে তাও করেছে। সব জায়গাতেই একই অবস্থা। গাড়ি নেই। অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষাই করছিল বোধন। কিন্তু আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবে? দুপুর ফুরোলো, বিকেল শেষ হল, সন্ধে হতে চলেছে।

"তুই ঠিক মতন বলেছিস? রাস্তা বুঝিয়ে দিয়েছিস?" সুকুমার বলল।

"হ্যাঁ," মাথা নাড়ল বোধন।

"তা হলে এত দেরি করছে কেন? ঘণ্টা চারেক হয়ে গেল?"

কোনো জবাব দিল না বোধন। সে কেমন করে জানবে কেন অ্যামবুলেন্স দেরি করছে!

"আমি একবার যাই, দেখি—" সুকুমার বলল।

বোধন তাকাল। কি ভাবল। মাথা নাড়ল ধীরে। "তুমি বরং বসো, আমি আর-একবার দেখছি।"

"কেন, তুই থাক। আমি দেখছি।"

"না, না। তুমি থাকো। আমার বাড়িতে থাকতে বড় ভয় করছে।" বোধন ভীত, বিহ্বল মুখে তাকাল সুকুমারের দিকে। বাড়িতে থাকলেই তাকে মা আর বাবাকে দেখতে হচ্ছে। সে পারছে না। অচৈতন্য মা আর অসহায় বাবাকে সে আর চোখে দেখতে পারছে না।

"বেশ। তবে যা তুই। কিন্তু কতবার যাবি আসবি?"

বোধন উঠল। উঠে ঘরে গেল। বাতি জ্বালিয়ে দিল। মা সেই একই রকম। সেই ভাবেই বিছানায় পড়ে আছে। বাবা বোধ হয় মার মাথাটা আরও একটু উঁচু করে দিয়েছে নিজের বালিশটা গুঁজে দিয়ে। হাত দুটোকে কোলের কাছে সরিয়ে দিয়েছে সামান্য। পায়ের দিকের কাপড় গুছিয়ে রেখেছে। মার মাথার কাছে চুপ করে বসে আছে বাবা। বসে থেকে কখনও মার কপালে গালে হাত রাখছে, কখনো মাথার চুলে। সেই কখন থেকে বাবা এই একই ভাবে মার মাথার কাছে বসে। সারাদিন মুখে কিছু দেয় নি। বাবাও নয়, বোধনও না। নীচে থেকে ঝমরুর মা মুখে দেবার জন্যে কিছু

পাঠিয়েছিলেন, বোধনরা খায় নি, খেতে পারে নি। জবাদি বিকেলের গোড়ায় গোড়ায় এসে খানিকটা চা করে দিয়েছিল, সেটা বোধনরা খেয়েছে।

এই ঘর ওই বিছানা—বোধনের আর সহ্য হচ্ছিল না। সে আর দেখতে পারছিল না মার ওই একই ভাবে অচেতন হয়ে বিছানায় পড়ে থাকা, বাবার ওই স্থির হয়ে পুতুলের মতন বসে থাকা—ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সমস্ত ঘরটাও কেমন অসাড়, অচেতন হয়ে আছে। বড় বেশি ঠাণ্ডা, কনকনে লাগছিল। সকালের সেই গন্ধ কখন চলে গিয়েছে বাতাসে, এখন অন্য কোনো গন্ধ উঠছিল, যেন মার বিছানায় কিসের এক দুর্গন্ধ জমে উঠেছে।

বোধন ঘরের চারপাশে অন্যমনস্কভাবে, শূন্য চোখে তাকাল। হলুদ, মিটমিটে আলো। মার শখের দেরাজের মাথায় কত কি পড়ে আছে, আয়না, চিরুনি, চুলের কাঁটা, কাঁচি, মোমবাতি। বেখাপ্পা ভাঙা আলনার ওপর মার শাড়ি, সায়া, জামা। দেওয়ালে ঠাকুমার ছবি। মা-বাবা ছেলেমেয়ের মেশানো একটা ধূসর ফটো। কালীঘাটের পট। সেলাই মেশিন মা বেচে দিয়েছিল, কিন্তু তার পাদানির ওপর নানা রকম জঞ্জাল জমিয়ে রেখেছে মা।

বোধন আবার বাবাকে দেখল। মানুষটা যেন এখন অনেক ধাতস্থ। কিংবা সমস্ত ভয়-ভাবনা ভুলে গিয়ে বাইরে বাইরে শান্ত ধৈর্যশীল হয়ে উঠেছে। ব্যাকুলতা ততটা নেই যতটা বেদনা; বেদনা যেন শতগুণ হয়ে বাবার মুখ পাথর করে রেখেছে।

সহ্যের সীমা আছে, চোখে দেখার একটা মাত্রা। বোধন আর সহ্য করতে পারছিল না, চোখে দেখতে পারছিল না এই প্রাণহীন, বুক ভাঙা দৃশ্য। তার ভয় করছিল। আর হয়ত মাকে বাঁচানো গেল না। হয়ত ওই ভাবে বাবার কোলের কাছে শুয়ে থেকে থেকে মা চলে

যাবে। কেউ কিছু বুঝবে না। কিন্তু বোধন কি করবে? সে তো যা করার করেছে। অ্যামবুলেন্স যদি না আসে কি করতে পারে বোধন?

"আমি আর-একবার যাচ্ছি" বোধন বলল। তার গলা শোনা যায় না।

তাকালেন শিবশংকর। যেন কথাটা শুনতে পান নি।

বোধন আবার বলল, "আমি এগিয়ে গিয়ে দেখি। মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। যদি ভুলটুল করে থাকে—, দেখি। এত দেরি কেন করবে?"

শিবশংকর স্ত্রীর মুখ গাল থেকে মশা তাড়াতে তাড়াতে বললেন, "আয়।"

"সুকুমারদাকে রেখে যাচ্ছি।"

বোধন যাচ্ছিল, শিবশংকর বললেন, "চুয়া গেল কোথায়?"

"জানি না। আমি তো সেই দুপুরের পর থেকে আর ওকে বাড়িতে দেখি নি।"

শিবশংকর আর কিছু বললেন না।

বোধনও বুঝতে পারছে না চুয়া কোথায় গেল? সাহা ডাক্তারকে রিকশায় উঠিয়ে বাড়ি ফিরে বোধন চুয়ার ঘরে দরজা খোলা দেখেছে। চুয়া বাথরুমে ছিল। বাবাকে অ্যামবুলেন্সের কথা বলে বোধন সঙ্গে সঙ্গে আবার বেরিয়ে গেল। ফিরে এসে চুয়াকে আর বাড়িতে দেখে নি। সে কি সত্যিই বাড়ি ছেড়ে চলে গেল এ-সময়?

ঘরের বাইরে এল বোধন। সুকুমার খাবার জায়গায় চেয়ারে বসে আছে। ব্যাংকের কাজ সেরে সে বিকেলের আগেই বোধনের কাছে এসেছে। বসে আছে তখন থেকেই। বসে বসে বোধনকে ভরসা দিচ্ছিল। অবশ্য সে জানে না, সুমতির অসুখটা ঠিক কী!

"সুকুমারদা, তুমি তা হলে একটু বসো, আমি ঘুরে আসি," বোধন বলল।

"হ্যাঁ, তুই যা।...একেবারে বড় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াবি। মুখটাতে। এখানে অনেক সময় রাস্তা ভুল করে।"

বোধন চলে যাচ্ছিল। সুকুমার আবার বলল, "দোকানে একটু বলে দিবি, বাড়িতে একটা খবর দিয়ে যেন বলে দেয় আমি এখানে আছি।"

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামল বোধন। হাউসিংয়ের ছোট ছোট টুকরো মাঠে বাচ্চারা খেলা শেষ করে ফিরে গেছে, জলের ট্যাঙ্কের ওপাশে জনা দুই বৃদ্ধ বাড়িতে ঢোকার মুখে শেষ কিছু কথাবার্তা বলছেন। অফিস ফেরত দু এক জনকে চোখে পড়ল!

হাউসিং পেরিয়ে একদিকে খানিকটা মাঠ মতন, অন্যদিকে ঘরবাড়ি। বেশ অন্ধকার হয়ে এল এরই মধ্যে। কুয়াশা জমা শুরু হল। এখনও কাছাকাছি জিনিস চোখে পড়ছে। সামান্য পরে আর পড়বে না। একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে। অ্যামবুলেন্সটা এখনও চলে আসতে পারে। আসা উচিত। কখন সে ফোন করেছে অথচ ঘণ্টা চার কেটে গেল। যদি বিপদের সময় না আসে তবে অ্যামবুলেন্স কেন? সাজিয়ে রাখার জন্যে? কলকাতায় অ্যামবুলেন্স কত কম! আবার বলা যায় না, বোধনদের যে-রকম দুর্ভাগ্য তাতে অ্যামবুলেন্স আসতে গিয়ে রাস্তায় কোথাও ভেঙে পড়ে আছে কি না!

বোধন সামনের দিকে চোখ রেখে হাঁটছিল, লক্ষ করছিল গাড়ি-টাড়ি কী আসছে! মনুয়াকে দেখতে পেল। সেই একই ভাবে আপন মনে হেঁটে যাচ্ছে, একা একা, খেপার মতন, কোনো দিকে চোখ নেই। মনুয়াকে দেখে বোধনের হঠাৎ কেমন মনে হল, বোধন অ্যামবুলেন্সের জন্যে মনুয়াদের বাড়ি যেতে পারত। ওদের ফোন আছে। মনুয়া তাকে সাহায্য করত। তাড়াহুড়োয় অত মনে থাকে না সব কথা।

এত দেরিই যখন হল, বোধন নীলুর খোঁজে গেলেও কাজের কাজ হত। তাহলে অ্যামবুলেন্স আর হাসপাতাল দুয়েরই ঝঞ্ঝাট হয়ত মিটে যেত।

বাজার ছাড়িয়ে যাবার সময় বোধন দেখল, রাস্তার সব বাতি দপ করে নিবে গেল। তার মানে লোড শেডিং। আজ এখনই? অবশ্য লোড শেডিংয়ের তো কোন ঠিক নেই। মার ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। বাবা লণ্ঠনটা জ্বেলে নেবে।

শীতের হাওয়ার সঙ্গে ধুলো, কয়লা, ধোঁয়া সব যেন মেশানো, আগাছার, ডোবার, কতক বা বড়বড় গাছপালার গন্ধও। বিনুদের বাড়ির দিক থেকে ধোঁয়া বেশি আসে রেল লাইনের জন্যে। বিনুর মাকে খবর দেওয়া গেল না আর। বোধনের যে কি হল উনি জানতে পারলেন না।

হন হন করে আরও খানিকটা এগুতেই বোধন একটা শব্দ শুনল। বিকট শব্দ। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখল বেশ খানিকটা তফাতে কিছু মানুষজন যেন রাস্তায় নেমে দূরে তাকাচ্ছে। কেউ কেউ গলিটলিতে ঢুকে পড়ছে। রিকশা সাঁ সাঁ করে চলে গেল।

একটা শব্দ থামতে না থামতেই আবার একটা। বোমা! বোমা মারামারি হচ্ছে তবে কি ওরাই রাস্তার বাতি নেবাল? ঘর বাড়ির বাতিও তো জ্বলছে না। লোড শেডিং-ই। রজনী আর শান্তদের যে-যুদ্ধ কাল শুরু হয়েছিল, হয়ে বন্ধ হয়েছিল, দু তরফের সুযোগ-সুবিধে বুঝে এখন আবার কি তা শুরু হল? কিন্তু দু দলের যুদ্ধক্ষেত্র তো বাজার নয়, বা এই রাস্তাটাও নয়, ইটখোলার কাছে, পাম্প হাউসের দিকে—যেখানে গোটা দুয়েক ভাঙা লরি পড়ে থাকে, আর গেঞ্জি কারখানার কাপড় শুকোয়।

বোধন কিছু বুঝল না। সামান্য ভয়ও হল।

ওই তো একটা গাড়ি এল হেডলাইট জ্বালিয়ে, রিকশাও আসছে

একটা। দোকানপত্রও বন্ধ হয় নি। বোধন এগিয়ে চলল। আর কিন্তু বোমা পড়ছে না। ব্যাপারটা কি? এত সহজে যুদ্ধ তো থামে না। ভাবতে ভাবতে আরও কয়েক পা এগুতেই আবার একবার শব্দ। তার পরই হল্লার মতন চিৎকার। এদিকে ওদিকে। দূরে কিছু একটা হচ্ছে। লোকজন এ-পাশেই চলে আসছিল।

বোধন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু তার দাঁড়িয়ে থাকার উপায় নেই। মোড় পর্যন্ত যাওয়া দরকার। অ্যামবুলেন্স গাড়িটা যদি দেখতে পায়!

একটু ভাবল বোধন। তার ভয় কিসের? সে না রজনীদের না শান্তদের দলের লোক। সে এই পাড়ার ছেলে। সবাই তাকে চেনে। সে আজ সাজ্ঘাতিক এক বিপদে পড়ে রয়েছে। তার মা সকাল থেকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে বাড়িতে। মাকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে। বোধন অ্যামবুলেন্স অ্যামবুলেন্স করে দুপুর থেকে পাগলের মতন ছোটাছুটি করছে। তার ওপর কে বোমা ছুঁড়বে, কেনই বা ছুঁড়বে! বোধন তো কারো শত্রু নয়। তা ছাড়া অ্যামবুলেন্স সব কিছুর বাইরে। অসুস্থ, মুমূর্ষ, মানুষকে বয়ে নিয়ে যায় হাসপাতালে। অ্যামবুলেন্সের গায়ে কেউ বোমা ছুঁড়বে না।

আর বোমা-টোমা পড়ছিল না। তবে হললা ছিল।

বোধন এগুতে লাগল দু পাশে চোখ রেখে। গঙ্গাপদর দোকান আধ-খোলা, লণ্ঠন জ্বলছে, মতি স্টোর্স মোমবাতি জ্বালিয়েছে গোটা কয়েক। এক জোড়া কুকুর ছুটছে। সবই যে বন্ধ তা নয়। তবে সবই খানিকটা তটস্থ হয়ে আছে।

এগুতে এগুতে বোধন প্রায় মোড়ের কাছে চলে এল।

বড় রাস্তা দিয়ে বাস যাচ্ছে। হর্ন শোনা গেল। গাড়ির আলো ছুটছে বড় রাস্তায়।

আরও কয়েক পা এগিয়ে আসতেই বোধন দেখল, তার মনে হল, একটা অ্যামবুলেন্স গাড়ি ঠিক মোড় পেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে। তা হলে শেষ পর্যন্ত এসেছে! সারা দুপুর আর বিকেলের উৎকণ্ঠা আর ভার যেন বুক থেকে হালকা হয়ে গেল। আবার পর-মুহূর্তে বুকটা টনটন করে উঠল। তার মাকে নিতে গাড়ি এসেছে। মা চলে যাবে। এতক্ষণ তবু মা বাড়িতে ছিল। ঘরে। চোখের সামনে। ওই গাড়িটা এসে গিয়েছে। আর মা থাকবে না।

বোধনের গলার কাছে ভয় আর কান্না লাফ মেরে উঠে এল। তারপর তার মনে হল, কেঁদে লাভ নেই। ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে মা বাঁচবে না। বাবাও তো হাসপাতালে ছিল কত দিন! গাড়িটা এসেছে। মাকে নিয়ে যাবে। মা বাঁচবে। এই গাড়ির জন্যে তো তারা দুপুর থেকে পথ চেয়ে বসে আছে।

প্রায় ছুটতে ছুটতে বোধন অ্যামবুলেন্সের সামনে এসে দাঁড়াল।

অ্যামবুলেন্সের কাছাকাছি, গাড়ি ঘিরে রজনীর কয়েক জন নাকরেদ দাঁড়িয়ে আছে। কচাকেও তার মধ্যে চোখে পড়ল। কচা, মাধব, তিনু, গোপাল আরও কেউ কেউ। তারা কেন অ্যামবুলেন্স ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বোধন বুঝল না। বোধ হয় পাড়ার মধ্যে গণ্ডগোল হচ্ছে বলে তার অ্যামবুলেন্সকে এই সময় ঢুকতে বারণ করছে। বা অন্য রাস্তা বুঝিয়ে দিচ্ছে। ঘুরে যেতে বলছে।

বোধন একেবারে গাড়ির কাছে গিয়ে বলল, "এই যে আমি! মার জন্যে অ্যামবুলেন্স ডেকেছিলাম। আমি ওদিকের রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি গাড়ি।"

বোধনের কথা কেউ শুনল বলে মনে হল না। আগেই দেখেছিল তাকে। গ্রাহ্য করল না। নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করছিল। ব্যস্ত, উত্তেজিত।

বোধন কিছু বুঝতে পারছিল না। গাড়িটাকে এরা অনর্থক দাঁড় করিয়ে রেখেছে কেন? সামনেই মাধব। মাধবকে বলল বোধন, "ব্যাপার কি! গাড়িটা আটকে রেখেছে কেন? আমি নিয়ে যাচ্ছি রাস্তা ঘুরিয়ে।"

মাধব তাকাল। "তুমি অন্য গাড়ি দেখো।"

বোধন অবাক হয়ে গেল। তার মানে? এ-গাড়ি তবে কার? বোধন বলল, "আমি দুপুর থেকে অ্যামবুলেন্স ডাকছি। আমার মা অজ্ঞান হয়ে বাড়িতে পড়ে আছে। হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।"

মাধব কচাদের কি বলতে লাগল, বোধনের কথা কানেই তুলল না।

"ব্যাপারটা কী?" বোধন চটে গেল।

"কিসের?"

"গাড়িটা ছেড়ে দাও। মাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে আমায়।"

"অন্য গাড়ি দেখো।"

"কেন এ-গাড়ি কার?"

মাধব কোনো জবাবই দিল না।

বোধনের কি তবে ভুল হল? এ-গাড়ি তার নয়? ছুটে সে গাড়ির ড্রাইভারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। পাকা পাকা চুল ড্রাইভারের, বুড়োটে মুখ। পাশে একটা লোক। ব্যাকুল, বিভ্রান্ত গলায় বোধন বলল, "দাদা, আমি গভর্নমেণ্ট হাউসিং থেকে ফোন করছিলাম। দুপুর থেকে অ্যামবুলেন্সের জন্যে ফোন করছি। বোধন চৌধুরী ব্লক সি, দোতলা। আমার মাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।"

"ওহি লোকদের বলুন। আমি বাবু অর্ডার মাফিক এসেছি," লোকটা বলল। বোধ হয় অ-বাঙালী।

"আমাদের জন্যে তো! গাড়ি আমাদের জন্যে…"

"হ্যাঁ হ্যাঁ ; বুধন চৌধুরী…"

"তবে চলুন।"

"ইসলোক রাস্তামে পাকড়ে নিল। আমি আমি কি করব! রোকতে বলল। রোকে দিলাম। গাড়ি লিয়ে হামলায় পড়ব! সিসাউসা তোড়ে দেবে।" বলে খুব নীচু গলায় বলল, "রঙবাজ পার্টি। হরবখত হামলা মাচায়।"

গাড়ি বোধনদের জন্যেই পাড়ায় এসেছে। মাধবরা আটকে রেখেছে। কেন? বোধনের মাথা গরম হয়ে উঠছিল। ব্যাপারটা কি?

বোধন আবার মাধবের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। "গাড়ি তো আমাদের জন্যে এসেছে। মাকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে। আটকে রাখছ কেন?"

"ফটিকদা জখম হয়েছে, হাসপাতালে লিয়ে যাব," কে একজন বলল।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত রাগে জ্বলে উঠল বোধনের। দুপুরে থেকে ফোন করে করে বসে বসে সে শেষ পর্যন্ত অ্যামবুলেন্স পেল এই সন্ধেবেলায়, আর সেই অ্যামবুলেন্স আটকে, কেড়ে নিয়ে ওরা ওদের ফটিকদাকে হাসপাতাল নিয়ে যাবে!

বোধন বোঝাবার মতন করে বলল, "আমি দুপুর থেকে ছোটাছুটি করছি অ্যামবুলেন্সের জন্যে। মার অসুখ। সাহা ডাক্তার সেই তখনই হাসপাতালে পাঠাতে বলেছে।"

"ট্যাক্সি করে লিয়ে যাও," মাধব বলল তাচ্ছিল্যের গলায়।

"ট্যাক্সি করে নিয়ে যাওয়া যাবে না।"

"তো অন্য গাড়ি দেখো।"

"বাঃ, এ আমার গাড়ি!…তুমি কেন বুঝছ না, আমার মা

সকাল থেকে বেহুঁশ।"

"ঝামেলা করো না। হাসপাতাল যাবার বহুত গাড়ি আছে।" বলে মাধব বোধনকে ঠেলে দিয়ে চেলাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "কিরে, তোরা শালা লড়তে চড়তেই রাত কাবার করবি। ফটিকদাকে লিয়ে আয়।"

"আসছে। রজনীদা সবুর করতে বলল। রজনীদা ফটিকদাকে লিয়ে আসবে।"

বোধন বুঝতে পারল, তার গাড়ি কেড়ে নিয়ে এরা ফটিককে হাসপাতালে পাঠাচ্ছে। বোধনের মা কিছু নয়। তার মা বাঁচুক বা মরুক রজনীদের কিছু আসে যায় না, ফটিক গোপাল কচা এরা অনেক দামী মানুষ। প্রাণের দাম ফটিকদের। যে-ফটিক বোমা বাঁধে, বস্তির ডাগর মেয়েদের নিয়ে রঙ করে, পুলিস যাকে মেরে কাঁধের হাড় ভেঙে দিয়েছিল।

রাগে, দুঃখে, হতাশায় বোধনের হুঁশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। মাধবরা তার মাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেবে না। তাদের গাড়ি কেড়ে নিয়ে নিজেদের লোক পাঠাবে। শালা, শয়তানের বাচ্চা সব।

আচমকা বোধনের মাথায় রক্ত চড়ে উঠল। কি মনে করে এরা। বোধন মাধবের মুখের সামনে হাত তুলে বলল, "না, এ-গাড়ি আমার। আমি নিয়ে যাব।"

মাধব তাকাল "ঝামেলা করো না।"

"কিসের ঝামেলা! আমি তোমাকে বলছি, আমার মা সকাল থেকে অজ্ঞান হয়ে বাড়িতে পড়ে আছে। দুপুর থেকে আমি অ্যামবুলেন্স ডাকছি। আর তুমি আমার গাড়ি কেড়ে নিচ্ছ। আমার মাকে মারতে চাও?"

"মা-ফা বাদে হবে। ফালতু কথা বাড়িয়ো না।"

"কিসের ফালতু কথা ?"

"এ-গাড়ি যাবে না। কিছু বলার থাকে, থানায় যাও।"

"কথা তুমি বাড়াচ্ছ!...গাড়ি আমার। আমাদের জন্যে এসেছে। রাইট আমাদের। আমায় ছেড়ে দাও।"

"তোমার বাবার গাড়ি।"

বোধন হুঁশ হারাল। "তোমাদের বাবারও নয়।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে বোধন বুঝল মাধব তাকে মারবে। সরবার চেষ্টাও করল। পারল না। মাধব প্রচণ্ড জোরে এক চড় মারল বোধনের মুখে। চড়টা সামান্য সরে বোধনের গলা আর ঘাড়ের কাছে লাগল। ভীষণ লাগল তার। মাধবের হাত লোহার মতন। "শালা শূয়ারের বাচ্চা..., বানচোত তুমি শালা আমার বাপ তোলো।" মাধব এবার জোরে লাথি কষাল বোধনের কোমরে।

লেগেছিল বোধনের। যন্ত্রণায় শব্দ করল। কিন্তু মুহূর্তে সে সমস্ত ভুলে গেল। ভুলে গেল তার ক্ষমতার কথা, যন্ত্রণার কথা। মাধবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। "শালা, শয়তান...।"

জামা ছিঁড়ে গেল মাধবের। বোধন ঝাঁপ মেরে জামাটাই ধরতে পেরেছিল মাধবকে নয়।

এবার ঘুঁষি চালাল মাধব। "হারামির বাচ্চা, তুই আমার ওপর হাত তুলিস। রোয়াবী। তোকে বানচোত তোর মার গভ্ভে পাঠাব আজ।" মাধব আবার লাথি মারল। বোধনের বুকের পাঁজরায়।

বোধনও ছাড়বে না। মুখ নীচু করে দু হাতে মাধবের জামা ধরে টানছে। জামা আরও ছিঁড়ে গেল। ঘুঁষি চালাল বোধন। মাধবের হাতে লাগল।

গোপাল বলল, "আবে এই শালা বোধন হটে যা...। খুন চড়িয়ে দিচ্ছিস বেকার। হঠে যা। মরে যাবি!"

অ্যামবুলেন্স আসার অপেক্ষা করছে। বাবা জানে না, বোধন এখন রাস্তায় পড়ে রয়েছে। বিনুর মার কথাও মনে পড়ল। বিনুর মা সারা বিকেল অপেক্ষা করেছিলেন সে আসবে বলে। বোধন যেতে পারে নি। বিনুও এখন তার অপেক্ষা করছে হয়ত। কে জানে? সুকুমারদা বোধনের জন্যে হাঁ করে বসে আছে।

কিন্তু বোধন কোথায়? বেদম মার খেয়ে জখম-হওয়া কুত্তার মতন পড়ে আছে। তার সারাদিনের অত চেষ্টায় ছোটাছুটি করে পাওয়া অ্যামবুলেন্স বেহাত। কী কপাল করেই এসেছিস সে। তারা। বাবা অক্ষম, অকর্মণ্য হয়ে গেল। মা দুটো ভাতের জন্যে কত কি করল। ছেলে মেয়ে স্বামীকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে করতে মার গায়ের রক্ত জল হল। আজ মা মরছে। দিদিও বাঁচবার জন্যে ঘর ছেড়ে পালিয়ে শেষ পর্যন্ত বেশ্যা। চুয়াও চলে গেল আজ···। কেন, কেন এ-রকম হবে?

বোধন ধুঁকতে ধুঁকতে কাঁদতে কাঁদতে উঠে পড়ছিল। আচমকা তার চোখে পড়ল, তার ডান পাশে ভাঙা দুধের বোতল পড়ে আছে। তলার দিকটা ভাঙা। কাচের ফলাগুলো ছোরার মতন তীক্ষ্ণ। বোধন আর হাতখানেক এপাশে পড়লে ওই ফলাগুলো তার গলায় মাথায় ঢুকে যেত।

হঠাৎ বোধনের মাথায় কি যেন হয়ে গেল। তার চেতনার তলা থেকে অদ্ভুত এক হিংস্রতা, জ্বালা—সারা জীবনের, সমস্ত কিছুর ক্রোধ যেন মাথার মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিল দপ করে। বোধন আর-একবার দেখল। বোতলের মুণ্ডুটা ধরা যায় হাতে।

বেহুঁশের মতন বোধন বোতলটা টেনে নিল। মুণ্ডুটা ধরল।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল বোধন। পা শক্ত করল প্রাণপণ। সামনে তাকাল। ওই তো মাধবরা। তবে আয় শালা, শূয়ারের

বাচ্চারা। চলে আয়। তোরা ভেবেছিস কি? সব তোদের, আমাদের কিছু থাকবে না?

মাধবের দিকে ছুটে যাচ্ছিল বোধন। "শালা, শয়তানের বাচ্চা।"

চারদিকে কেমন একটা আঁতকে ওঠার শব্দ হল। কারা যেন সরে গেল। বোধন কোনোদিকে খেয়াল না করে সমস্ত শক্তি দিয়ে ডান হাতটা ছুঁড়ল মাধবের দিকে।

পেছন থেকে অন্ধকারে কার হাত নেমে আসছে বোধন জানতে পারল না। হঠাৎ অনুভব করল পেছন থেকে তার কাঁধের কাছে ধারালো ভয়ঙ্কর কি বিঁধে গেল, গিয়ে তলার দিকে হাতের পাশ দিয়ে নেমে গেল। ভাঙা বোতল পড়ে গেল হাতের মুঠো থেকে।

চিৎকার করে উঠল বোধন। বিকটভাবে।

বোধন দুলছিল, পড়ে যাচ্ছিল, কুঁজো হয়ে হাঁটু ভেঙে পড়ে যেতে যেতে অন্ধের মতন তাকাচ্ছিল। কিছু নেই। সবই শূন্য। কানে এল, কে যেন চিৎকার করে কিছু বলছে, ভীষণ চিৎকার করে: হাঠো সব। হাঠ যাও। সামনে সে হাঠ যাও।

গাড়ির শব্দ উঠল আচমকা। গর্জনের মতন।

মুখ থুবড়ে, বেহুঁশ হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়তে পড়তে বোধনের মনে হল, অ্যামবুলেন্স গাড়িটা দপ্ করে বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে। ধীরে ধীরে তারই দিকে এগিয়ে আসছে যেন।

ততক্ষণে বোধন মাটিতে।